লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৮ বর্ষ ■ ৯ম সংখ্যা

১৫ নভেম্বর, ২০০৫ ঈসাব্দ

সম্পাদকীয়

সতর্ক হওয়ার সময় কি এখনও আসেনি?

আল্লাহ্‌তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য। কিন্তু মানুষ যখন তাকে সৃষ্টির এ উদ্দেশ্যকে ভুলে গিয়ে ইবাদত বিমুখ হয়ে নানা পাপাচারে লিপ্ত হয়, তখন আল্লাহ্‌তাআলা তাদেরকে বিপথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য নবী-রসূল পাঠান। এ প্রক্রিয়ায় যুগে যুগে প্রায় এক বা দুই লক্ষ ছব্বিশ হাজার নবী-রসূল এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। কিন্তু অনেক জাতি নবী-রসূলগণকে না মেনে, তাঁদের আহ্বানকে উপেক্ষা করে, তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন আল্লাহ্‌ও সীমালংঘনকারীদেরকে হেদায়তের পথে নিয়ে আসার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন, যেন এ ঐশী আযাব দেখে তারা সতর্ক হয়, অন্যরা শিক্ষা নেয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন–"আমরা (সতর্ক করার জন্য) রসূল প্রেরণ না করে কখনও আযাব অবতীর্ণ করি না।" (বনী ইসরাইল- ১৬)

আজ দেখুন, পৃথিবীতে কি হচ্ছে? সুনামীর তান্ডবে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, জাপান, থাইল্যান্ড সিংগাপুর, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশ হয়েছে লন্ডভন্ড। সুপারপাওয়ার, সুপারটেকনোলজির দেশ আমেরিকা টর্নেডোর মহা প্রলয়ে দিশেহারা। সাহায্যের জন্য সেখানেও মানুষের আকুল আর্তি, হাহাকার। ভূমিকম্পের মহাতান্ডবে বিপর্যস্ত জাপান, ইরান, ভারত, পাকিস্তান। দাবানলে জ্বলছে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইউরোপ। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিঃস্ব অসহায় আফ্রিকা। এইডসের হিংস্র থাবায় ধুকে ধুকে মরছে সারা বিশ্বের অগণিত মানুষ। ম্যাড কাউ, সার্স, বার্ডফ্লু, ইত্যাদির আতংকে ভীত-বিহ্বল বিশ্ববাসী।

একবার চিন্তা করেছেন কি? কেন এমন হচ্ছে? কেন একের পর এক বিপদ পৃথিবীতে নেমে আসছে? এর উত্তর একটাই, **হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)** যথাসময়ে এ জগতে এসেছেন। জগদ্বাসীকে হেদায়াতের পথে আহ্বান করেছেন। কিন্তু জগত তাঁর (আঃ) ডাক শুনেনি। তিনি (আঃ) সতর্ক করে বলেন, "হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও, হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নও। হে দ্বীপবাসীগণ! কোন কল্পিত খোদা তোমাদেরকে সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হতে দেখছি এবং জনপদগুলিকে জনমানবশূন্য পাচ্ছি। সেই লা-শরীক খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন, তাঁর সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতদিন তিনি নীরবে সহ্য করে গিয়েছেন, কিন্তু তিনি এবার রুদ্র মূর্তিতে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক ঐ সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলছি, এ দেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে, লূতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। কিন্তু খোদা শান্তি প্রধানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নয় কীট এবং যে তাঁকে ভয় করে না সে জীবিত নয় মৃত।" (হাকীকাতুল ওহী, ২৫৬-২৫৮পৃঃ)

জগৎ জুড়ে সংঘটিত এ আযাবের তান্ডবলীলা প্রতিশ্রুতি মসীহ্ ও মাহদী (আঃ)-এর এ সতর্ক বাণীর-ই বাস্তব প্রতিচ্ছবি। আল্লাহ্‌র প্রেরিত মামুরকে না মানলে তিনি তাঁর রুদ্র মূর্তি প্রকাশ করে এক ভয়ানক আযাবের রেশ কাটতে না কাটতেই আরেকটি আযাব দিয়ে যাবেন। এ কারণে এ ঐশী ক্রোধ থেকে মুক্তির পথ, উত্তরণের মাধ্যম হচ্ছে এ যুগ ইমামকে মেনে নেয়া, সময় থাকতেই সতর্ক হয়ে যাওয়া। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ-ও বলেন–'**সকল চেষ্টা নিষ্ফল, এখন একমাত্র অনুতাপকারীদের পথটিই খোলা আছে।**' তাই আমরা জগদ্বাসীকে আহ্বান জানাচ্ছি যুগ ইমামকে মেনে নিয়ে অনুতাপকারী হয়ে নিজেরাও হেফাযত থাকুন আর জগৎকেও হেফাযত রাখুন। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে খুব শীঘ্রই এমন রহমতের দিন দেখার তৌফীক দান করুন। আমীন।

১৫ নভেম্বর, ২০০৫ইং

সূচীপত্র — পৃষ্ঠা নং

- **কুরআন শরীফ** ৩
- **হাদীস শরীফ** ৪
- **অমৃতবাণী** ৫
- **জুমুআর খুতবা ঃ**
  রুগী দেখার ব্যাপারে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর আদর্শ ৬-১১
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)
  অনুবাদ– *মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান*
- **জুমুআর খুতবা ঃ** ১২-১৬
  প্রত্যেক আহমদী অন্যের দুর্বলতাকে ঢেকে রাখবে। কেউ কারো ত্রুটি খুঁজবে না।
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)
  অনুবাদ ঃ মাওলানা শেখ মুস্তাফিজুর রহমান ও মাওলানা মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম
- **হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চিঠি-পত্র** ১৭-১৯
  সংকলন– *ইয়াকুব আলী ইরফানী*
  অনুবাদ– *মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ*
- **কাদিয়ান আওর উসকে মোকাদ্দাস মোকামাত** ২০-২১
  অনুবাদ– *নাজির আহমদ ভুঁইয়া*
- **যাকাত ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়** ২২-২৪
  অনুবাদ– *মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান*
- **আহমদীয়াত ইয়ানী হাকীকী ইসলাম** ২৫-২৬
  মূল– *হযরত মির্যা বশীরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)*
  অনুবাদ– *মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান*
- **খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী** ২৭-২৯
  মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল
- **মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)** ৩০-৩২
  মূল– *হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)*
  অনুবাদ– *শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান*
- **কুরআনে আল্লাহ্ কি বলেন ইসলামের নামে আমরা কি করি** ৩২-৩৩
  এ.কে. রেজাউল করীম
- **মুলাকাৎ** ৩৪-৩৫
  সংকলন ও অনুবাদ ঃ মরহুম আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী
- **খাদ্য ও পুষ্টি সমাচার** ৩৬-৩৭
  মোহাম্মদ ফজলে এলাহী
- **সংবাদ** ৩৮

প্রচ্ছদ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)

ছবি ঃ হাফিয়া তাসাদ্দক

কুরআন শরীফ

সূরা আত্ তাওবা

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ
عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٦٨﴾

৬৮। মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং কাফিরদেরকে আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে। তাদের জন্য এই-ই যথেষ্ট এবং আল্লাহ্ তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন। এবং তাদের জন্য রয়েছে এক স্থায়ী শাস্তি।

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ
اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ
بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ
وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। (এদের অবস্থা) তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত যারা তোমাদের চাইতে শক্তিতে অধিক প্রবল এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অধিক প্রাচুর্যশালী ছিল। অতএব তারা যেভাবে তাদের ভাগের সুখ ভোগ করেছে আর যেভাবে তোমরাও তোমাদের ভাগের অনুসারে সুখ ভোগ করেছো আর তোমরা অনর্থক কথা বার্তায় সেভাবে মত্ত হয়েছ যেভাবে তারা অনর্থক কথা-বার্তায় মত্ত থাকতো। এদেরই কৃত-কর্ম ইহলোকে এবং পরলোকেও ব্যর্থ হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত।

اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ
وَّثَمُوْدَ ۙ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ
اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ
وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০। এদের কাছে কি এদের পূর্ববর্তীদের অর্থাৎ নূহ, আদ, সামূদ এবং ইব্রাহীমের জাতির এবং মিদিয়ানবাসী ও বিধ্বস্ত নগরীর[১১৯৮] অধিবাসীদের সংবাদ পৌঁছে নি? তাদের নিকট তাদের রসূলরা স্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিল। অতএব আল্লাহ্র পক্ষে তাদের প্রতি যুলুম করা সম্ভবই ছিল না বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করতো।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ
يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ
يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ
حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾

৭১। মু'মিন পুরুষরা ও মু'মিন নারীরা পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের নির্দেশ দেয়, মন্দ কাজে বাধা দেয়া আর তারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এদের প্রতি আল্লাহ্ অবশ্যই দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ
جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٧٢﴾

৭২। মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে আল্লাহ্ এমন সব বাগানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যেগুলোর পাদদেশ দিয়ে নদ-নদীমালা বয়ে যাবে, সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে, একইভাবে (প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) চিরস্থায়ী বাগানসমূহে উৎকৃষ্ট বাসস্থানের। তবে সবচেয়ে বড় হ'ল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ; এটাই মহান সফলতা।

১১৯৮। সদোম এবং ঘমোরার(আদিপুস্তক-১৯ঃ২৪-২৫) স্থানটিকেএখন 'মৃত সাগর' বলে মনে করা হয় (সদোম অধ্যায় জিউএনসাইক)। কুরআন বলে এ স্থানটি 'স্থায়ী রাস্তার' পার্শ্বে অথবা এর নিকটে অবস্থিত (১৫ঃ৭৫-৭৭)।

হাদীস শরীফ

খোদাতাআলা বান্দার নিয়ত দেখে থাকেন

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, তিনি হযরত রসূল করীম (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন তোমাদের পূর্বের উম্মতের তিনজন লোক কোথাও চলার পথে বৃষ্টি এসে তাদেরকে এক পর্বত গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তারা সেখানে প্রবেশ করার পর একখানা পাথর খসে পড়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। তারা পরস্পর বলতে লাগলো তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের খাঁটি আমলকে মাধ্যম বানিয়ে দোয়া করলে এই পাথরের বিপদ হতে মুক্তি পাবে। তাদের একজন বললো, হে আল্লাহ্ ! আমার পিতামাতা অতিশয় বৃদ্ধ ছিলেন। আমি আমার পরিবারকে খাওয়ানোর পূর্বেই তাদেরকে দুধ পান করিয়ে দিতাম। একদিন কাঠের সন্ধানে আমাকে বহু দূর যেতে হলো এবং যথা সময়ে বাড়ী ফিরে আসতে পারলাম না, এমনকি তারা ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন সময় তাদেরকে জাগিয়ে তোলাকে আমি পছন্দ করলাম না। আবার তাদের পূর্বে পরিবারকে দুধ খাওয়াতেও ভালো লাগছিল না। তাই আমি দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে তাদের জেগে উঠার অপেক্ষায় রইলাম। অপরদিকে সন্তানগুলো ক্ষুধায় আমার পায়ের কাছে কান্নাকাটি করছিল। এ অবস্থায় ভোর হয়ে গেল। তারা জেগে উঠলেন এবং দুধ খেলেন, হে আল্লাহ্ ! আমি যদি এ কাজটি তোমারই সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি তাহলে এই পাথরের দরুন যে বিপদে পড়েছি তা দূর করে দাও, এতে পাথরখানা কিছুটা সরে গেল। কিন্তু এর ফাঁক দিয়ে তারা বের হতে পারল না। দ্বিতীয়জন বললো, হে আল্লাহ্! আমার এক চাচাতো বোন ছিল। আমি তাকে সবচাইতে বেশি ভালবাসতাম। অন্য এক বর্ণনায় আছে পুরুষ নারীকে যত বেশি ভালবাসতে পারে আমি তাকে তত বেশি ভালবাসতাম। আমি তার সাথে মিলনের প্রস্তাব দিলাম কিন্তু সে তাতে রাজী হলো না। শেষে এক দুর্ভিক্ষের বছরে সে (সাহায্য নেবার জন্য আসলে) আমার নিকট এলে আমার সাথে নির্জনে মিলনের শর্তে একশত বিশটি মুদ্রা দিলাম। এতে সে রাজী হয়ে গেল। আমি যখন তাকে পেলাম তখন সে বললো আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং অবৈধভাবে আমার কৌমার্য নষ্ট করো না। আমি তখনই তাকে ছেড়ে চলে গেলাম, অথচ মানুষের মধ্যে সে আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়া ছিল। আমি তাকে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম। তা-ও ছেড়ে দিলাম। হে আল্লাহ্! আমি যদি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি তাহলে আমাদের এ বিপদ দূর করে দাও। এতে পাথরখানা কিছুটা সরে গেল, কিন্তু তাতেও তারা বের হতে পারলো না। তৃতীয় ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্! কয়েকজন মজুর রেখেছিলাম। আমি তাদের সবাইকে মজুরী দিলাম। কিন্তু একজন তার মজুরী ছেড়ে চলে গেল। আমি তার মজুরিটি ব্যবসায় খাটালাম। তাতে ধন-দৌলত অনেক বেড়ে গেল, কিছুকাল পর সে ব্যক্তি আমার কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আমার মজুরী দাও, আমি বললাম যত উট, গরু, ছাগল ও চাকর দেখছো এ সবই তোমার মজুরী। সে বললো, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করো না। তারপর সে সবকিছু নিয়ে চলে গেলএবং কিছুই রেখে গেল না। হে আল্লাহ্! আমি যদি তোমারই সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজ করে থাকি তবে আমাদের এ বিপদ থেকে মুক্তি দাও। তারপর পাথরটি সরে গেল এবং তারা সেখান হতে বের হয়ে এলো। (বুখারী ও মুসলিম)

ওপরে বর্ণিত হাদীসের ঘটনা দ্বারা সহজেই বুঝা যায় আল্লাহ্‌তাআলা তার সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তকে কখনো বৃথা যেতে দেন না। মানুষের প্রতিটি কর্মের প্রতি তাঁর দৃষ্টি রয়েছে তাই আমাদের সকলকে নিজেদের প্রতিটি কর্মে খোদার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিতে হবে। খোদার সন্তুষ্টির কর্ম ব্যতিরেকে তাঁর নৈকট্য কখনও সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌তাআলা নেক নিয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফীক দান করুন। আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

নবুওয়তের প্রকৃত উদ্দেশ্য

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁদের শিষ্যমন্ডলীদের পরস্পর তুলনা।

হুযূর আকদাস (আঃ) বলেন ঃ "আমি আশ্চার্যান্বিত হই যে, কেন ইসলামের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করা হয়? অথচ ইসলামের খোদা কোন কাল্পনিক খোদা নন বরং সেই সর্বশক্তিমান খোদাই আছেন যিনি আদিকাল থেকে আছেন। এখানে চিন্তা করে দেখুন, নবুওয়তের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

প্রথমতঃ এই যে, রসূল যুগের প্রয়োজনের সময়েই আসেন এবং উত্তমভাবে সেই প্রয়োজনকে পূর্ণ করেন। সুতরাং এ গৌরবও নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ভাগ্যেই জুটেছে। যখন আমাদের নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেন তখন অপরাপর অঞ্চলের কি অবস্থা ছিল তা কারো অজানা নেই, তারা সম্পূর্ণ বন্য পশুর মত ছিল, খাওয়া দাওয়া ছাড়া কিছুই জানতো না। না হুকূকুল ইবাদ (বান্দাদের জন্য দায় দায়িত্ব) না হুকূকুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র জন্য দায় দায়িত্ব) সম্পর্কে অবহিত ছিল। যেমন আল্লাহ্‌তাআলা কুরআনের এক স্থানে বলেছেন ঃ ইয়াকুলুনা কামা তাকুলুল আনআমা (অর্থাৎ তারা এমন ভাবেই পানাহার করে যেভাবে পশু পানাহার করে ৪৭ ঃ ১৩)। কিন্তু নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র শিক্ষা তাদের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে যার ফলে তাদের অবস্থা এরূপ হয়ে গেল– ইউবায়্যিতুনা লিরাব্বিহিম সুজ্জাদাও ওয়া কিয়ামা (২৫ ঃ ৬৫)

অর্থাৎ "তারা তাদের প্রতিপালকের স্মরণে সেজদাবনত ও দন্ডায়মান অবস্থায় রাত অতিবাহিত করে।" (২৫ ঃ ৬৫) সুবহানাল্লাহ্! কত শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কারণেই এক অপূর্ব বিপ্লব এবং অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পরিবর্তন ঘটে গেল। তিনি হুকূকুল ইবাদ ও হুকূকুল্লাহ্‌র দায়িত্বাবলীর ভারসাম্যপূর্ণ তুলা দন্ডে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

মৃতভক্ষক এবং মৃত জাতিকে এক উত্তম মর্যাদাশালী, জীবন্ত এবং পবিত্র জাতিরূপে উন্নীত করলেন। দু'টি গুণই উল্লেখযোগ্য হতে পারে। প্রথমতঃ জ্ঞান বিশিষ্ট ও কর্মবিশিষ্ট ; গুণের অবস্থা তাদের ইউবায়্যিতুনা লিরাব্বিহিম সুজ্জাদাও ওয়াকিয়ামা। আর জ্ঞান বিশিষ্ট গুণের অবস্থা এত ব্যাপক যে অগণিত রচনাবলী ও ভাষার গভীরতা বৃদ্ধির সাধনা ধারা জারী রয়েছে যার দৃষ্টান্ত বিরল। অপর পক্ষে যখন আমরা খৃষ্টানদের দিকে তাকাই তখন আমি বিস্মিত হই যে হাওয়ারীগণ খৃষ্টান হয়ে কি উন্নতি করেছেন? ইহুদা আস্‌কৃয়ুতী যিনি ঈসা মসীহ'র কোষাধ্যক্ষ ছিলেন কখনো কখনো আত্মসাৎও করতেন, মাত্র ত্রিশ টাকা গ্রহণ করে প্রভুকে ধরিয়ে দিলেন, বিষয়টি তার অবস্থার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করছে। ঈসা মসীহ'র থলীতে সব সময় দুই হাজার টাকা মওজুদ থাকতো। একদিকে তো তার এ অবস্থা; অপরদিকে তার তুলনায় রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা ছিল এই যে, মৃত্যুর সময় হুযূর আকদাস জিজ্ঞেস করলেন ; ঘরে কিছু আছে? হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, এক দীনার আছে। হুযূর আকদাস বললেন, এটা বন্টন করে দাও। ইহা কি সম্ভব যে আল্লাহ্‌র রসূল খোদাতাআলার দিকে সফর করবেন, আর ঘরে এক দীনার ছেড়ে যাবেন?

আমাকে বিস্মিত হতে হয় যে, খৃষ্টানগণ দর্শন-জ্ঞান, দর্শণ-জ্ঞান উচ্চারণ করতে থাকে ; জানি না খোদা সম্পর্কে তাদের দর্শণ-জ্ঞান কোথায় চলে গিয়েছে?–প্রায়শ্চিত্তবাদকেই দেখুন, এটা একটি কাল্পনিক পশুর ন্যায়। এই প্রায়শ্চিত্ত তাদেরকে কি দিয়েছে? এতে হাওয়ারীদের না তো জ্ঞান ভিত্তিক কোন সংশোধন হয়েছে, না কর্ম ক্ষেত্রে তাদের কোন সংশোধন হয়েছে। জ্ঞান ভিত্তিক সংশোধনের বিষয়ে তো ইঞ্জিল নিজেই ফয়সালা করে দিয়েছে যে, তারা স্থূল বুদ্ধির লোক ছিল, অল্প বুঝের ও লোভী মানুষ ছিল। স্বয়ং ইঞ্জিল একটি চিত্র অংকন করেছে যে, কেউ তো তাঁর প্রতি অভিশাপ দিয়েছে, কেউ ত্রিশ টাকার বিনিময়ে তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছে, আরো অনেক কিছু। তাদের পাপের প্রতিফল অন্ধকার ও শাস্তি তো এই পৃথিবী থেকেই আরম্ভ হয়ে যায় যেমন এরশাদ হচ্ছে –

"অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে অন্ধ হবে সে পরকালেও অন্ধ হবে"। এখন ঈসা মসীহ্'র শিষ্যদেরকে দেখুন, তাদের অবস্থাতে কি কোন পরিবর্তন ঘটেছে? আসলে পাপ দূরীভূত হলে অবশ্য মানুষের দৃষ্টি শক্তি ও জ্যোতি সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে এসব কোথায়? পরন্তু প্রায়শ্চিত্তের বিশ্বাস তাদেরকে অন্ধ করে ফেলেছে। (আল-হাকাম, ২৭ আগষ্ট ১৮৯৮)

অনুবাদ ঃ **মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক**
মুরব্বী সিলসিলা

রুগী দেখার ব্যাপারে মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর আদর্শ

[হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ) কর্তৃক ১৫ই এপ্রিল, ২০০৫ তারিখে লন্ডনস্থ মসজিদ বায়তুল ফুতূহতে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ , তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহার পর হুযূর (আইঃ) সূরা তাওবার নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করে খুতবা দেন ঃ

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদেরই মাঝ থেকে এক মহান রসূল তোমাদের কাছে এসেছে, তোমাদের কষ্টে পড়া তার জন্যে দুঃসহ, সে তোমাদের খুবই শুভাকাঙ্ক্ষী মু'মিনদের প্রতি সে পরম মমতাশীল, বারবার কৃপাকারী (সূরা তাওবা:১২৮)।

আঁ হযরত (সঃ) যেখানে অন্যদের ও নিজেদের আধ্যাত্মিক সংশোধনের জন্যে আর খোদাতাআলার সাথে তাদের সম্পর্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে অস্থির থাকতেন সেখানে সৃষ্টির কষ্টের কারণে তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতেও অনেক আবেগাপ্লুত থাকতেন। তাঁর প্রাণ এতে ভরপুর ছিল। অন্যের কষ্টের অনুভূতি তাঁর নিজ কষ্টের চেয়েও ছিল অধিক। বরং তাঁর নিজের কষ্টের অনুভূতি ছিলই না বলতে গেলে। সব সময় এ চেষ্টায় থাকতেন সুযোগ পেলেই যেন আমি আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি দেখাই, তাদের জন্যে দোয়া করি, তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করি।

সব সময় এ চেষ্টায় থাকতেন সুযোগ পেলেই যেন আমি আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি দেখাই, তাদের জন্যে দোয়া করি, তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করি।

এখন আল্লাহ্তাআলা এ আয়াতে তাঁর জন্যে যেসব শব্দ প্রয়োগ করেছেন- এ রসূল সব সময় তোমাদের মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা করে থাকে। এ আকাঙ্ক্ষা কোন সীমাবদ্ধ অর্থ দেয় না। যেভাবে আমরা বলে থাকি-আশায় থাকে, যদিও আশায় থাকা কোন সাধারণ বিষয় নয়। দুনিয়ার মানুষ আশা করে তো নিজের জন্যে করে থাকে যেন আমরা উপকৃত হই। আমাদের দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের প্রিয়-প্রভু ও নেতা (সঃ) যদি এ আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন তাহলে তা অন্যদের জন্যে, যেন তারা উপকৃত হয়, তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর হয়। যদিও এর আরও ব্যাপক অর্থ রয়েছে অর্থাৎ খুব জোরের সাথে এ আকাঙ্ক্ষা করা যেভাবেই হোক অন্যদের যেন উপকার করতে পারি। আর এতে নিজের ব্যক্তিগত আনন্দ ও সুখ অনুভব করা। আবার এ ব্যাপারে খুবই সাবধানতার সাথে অন্যের আবেগের সম্মান অক্ষুন্ন রেখে তার জন্যে ব্যথা ও সহানুভূতি পোষণ করা। তার জন্যে নিজে কষ্ট বরদাশ্‌ত করা। অন্যদের দুঃখ-কষ্ট দেখে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে এ আকাঙ্ক্ষা প্রস্ফুটিত হতো। পুনরায় এ দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্যে তিনি সব রকমের উপকরণ ও পন্থা ব্যবহার করতেন। এসব দুঃখ-কষ্ট দূর করতে আর অন্যদেরকে আরাম দিতে গিয়ে তাঁর (সঃ) প্রাণে অসীম দয়ার আবেগ উৎসারিত হতো। এতে তিনি কখনও ক্লান্ত হতেন না। অন্যদের জন্যে সহানুভূতি ও দয়ার আবেগ তাঁর মাঝে এমনভাবে ব্যাপ্ত ছিলো যে, কেউ এর মোকাবেলা করতে পারতো না। অসীম দয়ার পাত্র হওয়া আর বার বার করুণার প্রকাশ ঘটানো মানুষের মাঝে খোদার গুণাবলীর বিকাশের উত্তম দৃষ্টান্ত-এটা ছিল কেবল আর কেবল তাঁর (সঃ) সত্তায়। আল্লাহ্তাআলাই এর সাক্ষ্য দিচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন, আকর্ষণ ও সংকল্পের বন্ধন মানবকে তখনই দেয়া হয় অর্থাৎ দুঃখ-কষ্ট অনুভব করার শক্তি এবং দুঃখ-কষ্ট দূর করার অনুভূতি ও আবেগ দেয়া হয়, যখন কেউ খোদাতাআলার চাদরের ছায়ায় এসে যায়। আর যিল্লুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র ছায়ায় পরিণত হয়। আবার তিনি সৃষ্টির সেবা ও সহানুভূতির জন্যে নিজের মাঝে এক প্রকার ব্যথা অনুভব করেন। আমাদের নবী করীম (সঃ) এ মর্যাদার দিক থেকে সব নবীর (আলায়হিমুস সালাম) চেয়ে সবার আগে ছিলেন-তাই তিনি (সঃ) সৃষ্টির দুঃখ-কষ্ট দেখতেই পারতেন না। অতএব আল্লাহ্তাআলা বলেন, 'আযীযুন'আলায়হে মা আনিত্তুম অর্থাৎ রসূল (সঃ) তোমাদের কষ্ট দেখতে পারেন না। তিনি এতে খুবই কষ্ট পান। আর সব সময় তোমাদের বড় কল্যাণ পৌছানোর ব্যাপারে তাঁর মন ব্যথিত হয়ে থাকে (আল্ হাকাম, ৬ খন্ড নং-২৬, পৃষ্ঠা ৬, তারিখ ২৪-০৭-১৯০২)।

অতএব অন্যদের জন্যে তাঁর আবেগের যে অবস্থা হতো এতে এর আরও ব্যাখ্যা হয়ে গেল। মানুষের মাঝে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য দুঃখ-কষ্টের ব্যাপারে চিন্তা ও উদ্বেগ-অস্থিরতা হয়ে থাকে। এর মাঝে এমন একটি উদ্বেগ কম বেশি সবাইকে যার সম্মুখীন হতে হয় বরং এটা বলা উচিত, প্রত্যেকেরই কোন না কোনভাবে দুঃখ-কষ্ট হয়ে থাকে আর তা হলো শারীরিক রোগ-ব্যাধি। আজ আমি আঁ হযরত (সঃ)-এর উত্তম আদর্শের এ দিকগুলো সম্বন্ধে আলোকপাত করবো যা তাঁর রোগীকে দেখার সাথে সম্পর্ক রাখে আর তিনি (সঃ) কিভাবে দোয়ার প্রতি মনোনিবেশ করতেন তা-ও আলোচনা করবো।

তাঁর (সঃ) জীবনাদর্শ থেকে আমরা জানতে পারি, নিজের দুঃখ-কষ্টের জন্যে তিনি চিন্তা করতেন না। তাঁর উদ্বেগ ছিল কেবল অন্যদের জন্যে। যেভাবে আমি বলেছি, এমন ব্যথা-বেদনা নিয়ে দোয়া করতেন এর কোন দৃষ্টান্ত মেলা ভার। কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি উপস্থাপন করছি। রুগীদের জন্যে তিনি (সঃ) কিভাবে দোয়া করতেন এরকয়েকটি ঘটনা বলছি। এতে আমরা তা জানতে পারবো কিভাবে তিনি (সঃ) তাদের খোঁজ-খবর নিতেন। তাঁর কী পদ্ধতি ছিল। কিন্তু এর আগে একজন সাহাবীর এ সাক্ষ্য সম্বন্ধে আমি বলে দিচ্ছি। বর্ণনায় এসেছে। হযরত আবূ উমামার সাক্ষ্য এই ঃ তিনি (সঃ) সব মানুষের মাঝে রুগীদের উত্তম পরিদর্শনকারী ছিলেন (সুনানে নিসাঈ)।

অতএব এ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, নিজের চেয়েও অধিক আবেগ নিয়ে তিনি (সঃ) রুগীদের দেখতেন বা পরিদর্শন করতেন। ছোট-খাট দুঃখ-কষ্ট তো মানুষের লেগেই থাকে। কিন্তু এ প্রসঙ্গেও যার সাথে যোগাযোগ হতো তিনি (সঃ) তার খোঁজ-খবর নিতেন। কিন্তু কেউ যদি ২/৩দিনের অধিক রুগ্ন থাকতেন আর তিনি (সঃ) তা জানতে পারতেন তিনি (সঃ) তখন তখনই তাকে দেখার জন্যে ছুটে যেতেন আর তার জন্যে দোয়া করতেন।

সুতরাং এ প্রসঙ্গে একটি বর্ণনায় এসেছে। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন। কেউ ৩ দিনের অধিক রোগাক্রান্ত হলে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখার জন্যে যেতেন (সুনানে ইবনে মাজাহ্)।

যেভাবে আগের বর্ণনায় এসেছে, তাঁর চেয়ে উত্তম রোগী পরিদর্শনকারী কেউ নেই। যখন তিনি এত প্রেম ও ভালবাসা নিয়ে রোগী দেখতে যেতেন তখন রুগীর অর্ধেক রোগ তো এমনিতেই ভাল হয়ে যেত। সাধারণভাবে দেখা যায়, ডাক্তার রুগীকে মনোনিবেশের সাথে দেখলে, তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলে রুগীর অর্ধেক রোগ ভাল হয়ে যায়। সেই ডাক্তারকে রুগী পসন্দ করে থাকে, যে এভাবে দৃষ্টি দিয়ে তাকে দেখে থাকে ও তার কথা শুনে থাকে। সব চিকিৎসক ও ডাক্তারদের চেয়ে যিনি উত্তম চিকিৎসক তিনি আসার পর রুগী ভাল হবে না এটা কি করে হতে পারে? তিনি তো খুবই গভীর মনোযোগ দিয়ে রুগীর কথা শুনতেন এবং দোয়াও করতেন। রোগীর চিকিৎসায় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই কল্যাণ লাভ হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌তাআলার অনুমতি না হলে ঔষধে আরোগ্য হতে পারে না। ঔষধে আরোগ্য আল্লাহ্‌র আদেশেই হয়ে থাকে। তাই তাঁর (সঃ) এ পদ্ধতি ছিল, যখনই তিনি রুগীর কাছে যেতেন তার জন্যে দোয়া করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন কোন স্ত্রীর অসুখ দেখতে আসতেন তখন তাঁর ডান হাত তার শরীরে বুলাতেন আর দোয়া করতেন। আসহিবিল বা'সা রব্বান্নাসি ওয়াশ্‌ফি আন্‌তাশ্‌ শাফী' লা শিফায়া ইল্লা শিফাউকা শিফায়াল্লা ইউগাদিরু সাক্বামা। অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্, যিনি মানুষের প্রভু! এ রোগীর রোগকে দূর করে দাও। তুমি আরোগ্যদানকারী, তোমার আরোগ্য ছাড়া আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দাও যেন কোন রোগের চিহ্নও না থাকে (মুসলিম কিতাবুস্ সালাম, বাবু ইসতিজাবু রুক্‌কইয়াতুল মা'রিয)। এটা কেবল তাঁর ঘরানাদের জন্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো না, বরং অন্যান্য রোগীদের সাথেও তাঁর এ আচরণ ছিল। যখনই রুগী দেখতে যেতেন তার জন্যে অবশ্যই দোয়া করতেন।

অতএব নিজ সাহাবাদের সাথে মমতা ও তাদের রোগ-ব্যাধির জন্যে দোয়া করার ব্যাপারে বর্ণনা এসেছে।

হযরত আয়েশা বিন্‌তে সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেন। আমার আব্বা বর্ণনা করেছেন, আমি মক্কায় খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ি। আঁ হুযূর সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখার জন্যে আসেন। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ)! আমি ধন-সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছি কিন্তু আমার উত্তারাধিকারী কেবল একটি কন্যা মাত্র। এর ওপর হুযূর (সঃ) জানতে চাইলেন, তার জন্যে কতটা সম্পদ ছেড়ে যাবে? যা-ই হোক সম্পদের কথা হচ্ছিল। তিনি বল্লেন, কতটা ছেড়ে যেতে চাও? এখানে যেহেতু রোগের সাথে সম্পর্ক ছিল, কতটা অংশ আমি বলে দিচ্ছি। বলা হয়ে থাকে, কথা-বার্তা বলার পর আঁ হুযূর (সঃ) তাঁর পবিত্র হাত আমার কপালে রাখলেন, আবার আমার মুখমন্ডলে ও আমার পেটে তাঁর পবিত্র হাত মলতে লাগলেন এবং দোয়া করলেন-

আল্লাহুমা ইশ্‌ফি সা'দান ওয়া আতিমনা লাহু হিজরতাহু অর্থাৎ হে আল্লাহ্! সা'দকে আরোগ্য কর আর তার হিজরতকে পুরো কর।

হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, এখনও যখন আমি সেই ঘটনা স্মরণ করি আঁ হযরত (সঃ)-এর পবিত্র হাতের শীতল ঘাম আমার পেটে অনুভব করে থাকি (আল্ আদাবুল মুফার্‌রদ লিল বুখারী)।

আবার ইব্‌নে মুনকাদির (রাঃ) বর্ণনা করেন। তিনি জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, আমি একবার রোগাক্রান্ত হই। তখন নবীয়ে করীম (সঃ) আর আবূবকর (রাঃ) আমাকে দেখার জন্যে আসেন। তাঁরা আমাকে বেহুশ অবস্থায় দেখতে পান। এরপর হুযূর (সঃ) ওযূ করলেন এবং ওযূর অবশিষ্ট পানি আমার ওপর ছিটিয়ে দিলেন। এতে আমি হুশ ফিরে পেলাম। যখন আমি হুশ হলাম, তিনি বলেন, তখন নবী করীম (সঃ)-কে আমার কাছে দেখতে পেলাম। প্রবল জ্বর দূর করার জন্যে পানি দিয়ে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। পানি পট্টি দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এ পানি তো ছিল দোয়ায় ভরপুর। হুযূর (সঃ)ও সম্ভবত এজন্যে বসেছিলেন যেন তার জন্যে বিশেষভাবে দোয়া করতে পারেন।

আবার আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা) বর্ণনা করেন, আমরা হুযূর (সঃ)-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। এক আনসারী আসলেন। হুযূর (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আমার ভাই সা'দ বিন আবূ উবায়দার কী অবস্থা? বলা হলো, এখন ভাল। এর ওপর হুযূর (সঃ) বল্লেন, তাকে দেখার

জন্যে তোমাদের কে কে যাবে? সুতরাং হুযূর (সঃ) উঠে দাঁড়ালেন আর আমরা প্রায় ১৩ জন তাঁর সাথে রওয়ানা দিলাম। হযরত সা'দ বিন উবায়দাকে ভাল দেখতে পেলাম (সহী মুসলিম)। তাই একেতো নিজের সাথীদের এ অনুভূতি জাগাবার জন্যে তাঁর সাথে নিয়ে গেলেন যে, রুগীদের দেখতে যাওয়া আবশ্যক। তার রোগ-ব্যাধি সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেয়া আবশ্যক। আবার তাঁর দোয়া করার যে সাধারণ রীতি ছিল এজন্যেও যে, আমার সাথে লোক থাকবে। আমরা দোয়া করবো বেশি বেশি লোক এতে শামেল থাকবে।

রোগ-ব্যাধিতে মানুষের আবেগ খুবই ভরপুর থাকে। এ অবস্থায় যারা দেশ থেকে দূরে থাকে তাদের দেশের কথা বেশি বেশি মনে পড়তে থাকে। হযরত আবূ বকর ও হযরত বেলাল (রাঃ) একবার রোগাক্রান্ত হলেন। তাদের আবেগের অবস্থাও তখন এমনটিই ছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ) এভাবে বর্ণনা করেন:

যখন রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মদীনায় চলে এলেন তখন হযরত আবূবকর ও বেলাল জ্বরে আক্রান্ত হলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তাঁদেরকে দেখার জন্যে গেলাম। আমি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বল্লাম, আব্বা, আপনার অবস্থা কি? হে বেলাল! তোমার অবস্থাই বা কি? হযরত আবূবকর (রাঃ)-এর জ্বর হলে তিনি এ কবিতার পংক্তি পড়তেন,

কুল্লু মরিইনা মুসাব্বাহুন ফী আহ্লিহী ওয়াল মাউতু আদনা মিন শিরাকি না'লিহী অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বাড়ীর লোকদের মাঝে ভোর বেলা ওঠে এমন কি তার মৃত্যু তার জুতোরও ফিতার কাছে এসে পৌছে।

আর হযরত বিলালের জ্বর যখন ছেড়ে যেত তখন তিনি নিজের চাদর সরিয়ে দিয়ে মক্কাকে স্মরণ করে কবিতার পংক্তি পাঠ করতেন, এর অর্থ এই-

হায়! আমার সেদিন কবে আসবে যখন আমার রাত এমন উপত্যকায় কাটাবো যে, আমার আশে পাশে 'ইসঘির' খাস ও 'জলীল' উৎপন্ন হয়ে থাকবে।

হযরত আয়েশা বলেন, যখন আমি হযরত আবূ বকর ও হযরত বেলাল (রাঃ)-এর এ অবস্থা দেখলাম তখন আমি এসে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে এ সম্বন্ধে অবহিত করলাম। এর ওপর নবী করীম (সঃ) দোয়া করলেন। হে আল্লাহ্! আমাদের কাছে মক্কার চেয়ে মদীনাকে অধিক প্রিয় করে দাও আর এর জলবায়ু সঠিক করে দাও এবং আমাদের জন্যে এর সা' ও মুদ (আরবী মাপ বিশেষ)-কে কল্যাণমন্ডিত করে দাও। আর এর রোগ-ব্যাধি জুহ্ফা এলাকায় দূর করে দাও (আদাবুল মুফার্‌রদ)।

আঁ হযরত (সঃ) তাঁদের আবেগকে উপলব্ধি করে কেবল রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তির জন্যেই দোয়া করেন নি বরং মাতৃভূমি থেকে দূরে থাকার কারণে যে অস্থিরতা তা-ও দূর করার জন্যে মদীনার সাথে ভালবাসা সৃষ্টিরও দোয়া করেছিলেন।

আবার দোয়ার ধারাবাহিকতায় হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ)-এর একটি বর্ণনা রয়েছে। যখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পরিবারের কেউ রোগাক্রান্ত হতো তখন হুযূর (সঃ) মুয়াভিযাতায়েন অর্থাৎ 'কুল আ'উযু বিরব্বিল ফালাক্ব' ও 'কুল আ'উযু বিরব্বিন্নাস' পাঠ করে ফুঁক দিতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন আঁ হুযূর (সঃ) অনেক বয়সে অসুস্থ হলেন তখন আমিও আঁ হুযূর (সঃ)-এর হাতে এ সূরাগুলো পাঠ করে ফুঁক দিতাম। আর তাঁর হাত দিয়েই তাঁর শরীর মলে দিতাম। কেননা, তাঁর হাত আমার হাত থেকে অনেক বরকতমন্ডিত ছিল (মুসলিম কিতাবুত্ত্বিব)। সবক তিনিই শিখিয়ে ছিলেন। সাহাবারাও এটা ব্যবহার করতেন।

আবার একটি বর্ণনায় এসেছে। হযরত আবূ হুরায়রা বর্ণনা করেন, নবী করীম (সঃ) এক ব্যক্তিকে তার জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় দেখতে আসেন আর তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, কল্যাণ হোক। আল্লাহ্তাআলা বলেন, জ্বর হলো আমার আগুন। আমি একে আমার পাপী বান্দাদের জন্যে ধার্য করি যেন জাহান্নামের আগুনে তার যে অংশ তা যেন এ দুনিয়াতেই লাভ হয়ে যায়। এভাবে তিনি (সঃ) তাকে সান্ত্বনাও দিয়েছেন। ধৈর্যের নির্দেশও দিয়েছেন। রোগীকে তার অবস্থা ও ঈমানের পর্যায় অনুযায়ী সান্ত্বনাও দিয়ে থাকতেন। ভিন্ন ভিন্ন লোককে ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় দিতেন। ফায়েদ বিন আরকম বর্ণনা করেন। যখন আমার চোখের অসুখ ছিল তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাকে দেখতে আসেন (আবূ দাউদ)।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন। খন্দকের যুদ্ধে যখন সা'দ বিন মো'আয (রাঃ)-কে কোন শত্রু তাঁর হাতে লেজা দিয়ে আঘাত করে এতে তাঁর হাতের রগ কেটে যায়। তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মসজিদে নবুবীতেই তার তাবু খাটিয়ে দেন যেন তিনি (সঃ) তাকে দেখা-শুনা করতে পারেন (আবূ দাউদ)। চিকিৎসা সত্ত্বেও এ আঘাত যখন আরোগ্য হচ্ছিল না তখন তিনি (সঃ) সাহাবাদের সাথে তাঁর সেই ভালবাসার আবেগে এটাই মনে করলেন যে, তাকে কাছে রাখেন যেন চিকিৎসার তত্ত্বাবধানও হতে থাকে আর তিনি স্বস্তি লাভ করেন এবং হযরত সা'দ (রাঃ)-এর দেখা শুনাও তিনি (সঃ) করতে পারেন। একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় তিনি (সঃ) তার জন্যে এমন ব্যবস্থা করেন যেন রীতিমত একজন নার্সের ব্যবস্থা করে দেন যেন সে সব সময় দেখাশুনা করে। পট্টি লাগিয়ে দেয়। সেবা-শুশ্রুষা করে। আর মসজিদে নবুবীতে এমন ব্যক্তিদের চিকিৎসার সুবিধার ব্যবস্থা হতো আর সেখানেই তাদের সেবা-শুশ্রুষা প্রভৃতি হতে থাকতো।

আবার হযরত উম্মে 'আলা (রাঃ) বর্ণনা করেন। আমি অসুস্থ ছিলাম। আঁ হযরত (সঃ) আমাকে দেখার জন্যে এখানে এলেন। আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বলেন, হে উম্মে 'আলা! রোগের একটি অংশ রয়েছে সুসংবাদপূর্ণ। কেননা, আল্লাহ্তাআলা রোগের কষ্টের কারণে একজন মুসলমানের পাপ এভাবে দূর করে দেন যেভাবে আগুন সোনা রূপার খাদ দূর করে দেয় (আবূ দাউদ)। দেখুন, কিভাবে রুগীদের সান্ত্বনা দিতেন তিনি। একথা তিনি (সঃ) ভাল মনে করতেন না যেন রোগের কারণে রোগকে গালি-গালায করা হয় যে, কমবখ্ত রোগ আক্রমণ করেছে! রোগকে মন্দ বলা হয়। অনেকের এ রকম বলার অভ্যাস আছে।

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন। নবী করীম (সঃ) উম্মে সাহেব-এর কাছে গেলেন আর তাকে কষ্টে নিপতিত দেখলেন। এর ওপর

হুযূর (সঃ) বল্লেন, তোমার কী হয়েছে? উম্মে সাহেব জবাবে বল্লেন, জ্বর। খোদা একে ধ্বংস করুন! নবী করীম (সঃ) বলেন, থাম, জ্বরকে গালি দিও না। কেননা, এটা মু'মিনের ত্রুটি-বিচ্যুতি এমনভাবে দূর করে দেয় যেভাবে ভাটি (আগুনের তাপ) সোনার নোংরা ময়লা দূর করে দেয় (আল্ আদাবুল্ মুফার্‌রাদ)। যদিও দোয়া অবশ্যই করা উচিত। আল্লাহ্‌তাআলা যেন আরোগ্য দান করেন। কিন্তু এভাবে রোগকে গালি-গালায় করা উচিত নয়। আল্লাহ্‌র সাহায্য চাওয়া উচিত।

আর এ রোগের ওপর ধৈর্য ধারণের নির্দেশ কেবল অন্যদের জন্যে ছিল না বরং নিজেও কখনও অসুস্থ হলে বা কষ্ট পেলে সবচেয়ে বেশি ধৈর্য দেখাতেন।

তাঁর (সঃ) রোগকালীন এক ঘটনার উল্লেখ এসেছে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন। এমন অবস্থায় নবী করীম (সঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম যে, হুযূর (সঃ) চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলেন। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) তাঁর চাদরের ওপর থেকে প্রবল জ্বর অনুভব করলেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ)! কোন কোন লোকের এমন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। আঁ হুযূর (সঃ) বলেন, নবীদের, এর পর সালেহীনদের। আর নেক লোকদের কাউকে তো অভাব-অনটন দিয়ে পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। আর অভাবের কারণে কখনও তার পরার জন্যে কেবল একটি জুব্বাই থাকে যা দিয়ে তার পরার ও গায়ে দেয়ার কাজ সমাধা হয়ে থাকে। আবার কখন তাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। আর এমন অধিক হয় যে, তাকে নিহত করেই দেয়া হয়। আর এদের প্রত্যেকেই এতে এমনভাবে খুশী হয় যেভাবে তোমরা কোন কিছু পেলে খুশী হয়ে থাক (আল্ আদাবুল মুফার্‌রদ)। এটা ছিল তাঁর (সঃ) উত্তম আদর্শ। রোগীর ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্‌তাআলার দরবারে বেশি বেশি করে ঝুঁকে থাকা আবশ্যক। নবীরা তো পবিত্র হয়ে থাকেন। আর তিনি (সঃ) তো সবচেয়ে বেশি পবিত্র ছিলেন। তিনি (সঃ) বলেছেন, আমার শয়তান তো মুসলমান হয়ে গেছে। তাই নবীদের যে অসুখ হয়, জ্বর হয় তা পাপ মুক্তির জন্যে নয়। বরং ধৈর্য ও সন্তুষ্টির একটি দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্যে হয়ে থাকে। এতে মান্যকারীরা জানতে পারে ইনি কেবল উপদেশই দেন না বরং নিজেও এর ওপর আমল করেন এবং ধৈর্য ও সন্তুষ্টির নমুনা দেখান।

আঁ হযরত (সঃ)-এর আদর্শের ওপর চলতে ও চলতে থেকে তাঁর সাহাবারাও অসুস্থাবস্থায় দোয়ার ওপর জোর দিতেন আর এ পদ্ধতিই আমাদের নিকট ছড়িয়ে দিতেন।

আব্দুল আযীয বর্ণনা করেন। আমি ও সাবেত আনাস বিন মালেক (রাঃ)-কে দেখতে গেলাম। সাবেত বলেন, হে আবূ হামযা! আমি অসুস্থ। এতে হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি কি সে রকম ফুঁক দিব না যেভাবে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) রুগীকে দিয়ে থাকতেন? তিনি বলেন, কেন নয়? হযরত আনাস (রাঃ) এসব শব্দে ফুঁক দিলেন- আল্লাহুমা রব্বান্নাসি মুযহিবাল বা'সি ইশ্‌ফি আনতাশ্ শাফী লা শিফায়া ইল্লা আন্‌তা শিফায়া লা ইউগাদিরু সাক্বামা-হে আল্লাহ্! যিনি লোকদের প্রভু-

নবীদের যে অসুখ হয়, জ্বর হয় তা পাপ মুক্তির জন্যে নয়। বরং ধৈর্য ও সন্তুষ্টির একটি দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্যে হয়ে থাকে। এতে মান্যকারীরা জানতে পারে ইনি কেবল উপদেশই দেন না বরং নিজেও এর ওপর আমল করেন এবং ধৈর্য ও সন্তুষ্টির নমুনা দেখান।

প্রতিপালক, হে সেই সত্তা যিনি কষ্টকে দূর করে দিয়ে থাক, আরোগ্য দান কর, তুমিইতো আরোগ্যদানকারী। কেননা, তুমিই আরোগ্য দান করে থাক। তুমি ছাড়া আরোগ্যদানকারী কেউ নেই। একে এমন আরোগ্য দান কর যেন রোগের কোন প্রভাব অবশিষ্ট না থাকে।

তাই রোগীকে স্বয়ং নিজের রোগের জন্যে দোয়া করা উচিত। নিজের রোগকে গালি-গালায় করা উচিত নয়। অন্য রোগীকে দেখতে গেলে তার জন্যেও দোয়া করা উচিত। আর এভাবে দোয়ার সাথে সদকা-খয়রাতও করা উচিত। আঁ হযরত (সঃ) এ প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অতএব একটি বর্ণনায় এসেছে। তিনি (সঃ) বলেছেন, নিজের রুগীর চিকিৎসা সদকা-খয়রাত দিয়ে কর। এটা তোমাদের রোগ-ব্যাধি এবং ভবিষ্যত পরীক্ষাকে দূরীভূত করে থাকে। রোগের অবস্থায় সদকা-খয়রাতের আদেশ রয়েছে। এ-ও এক প্রকার প্রতিকার। আবার রোগ-ব্যাধি ও বালা-মুসিবত থেকে সুরক্ষার জন্যে এভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সদকা-খয়রাত করতে থাক। কেননা, ছোট-খাট পরীক্ষা এলে দোয়া ও সদকা খয়রাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তাআলাই এর কুফল থেকে রক্ষা করে থাকেন। আবার তিনি রোগী দেখার সময় রোগীর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী খাবার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিতেন। রুগীর ব্যাপারে এমন কোন বিষয় নেই যা তিনি (সঃ) ছেড়ে দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে একটি বর্ণনায় এসেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন। হযরত নবী করীম (সঃ) এক রোগী দেখতে গিয়ে তার কাছে জানতে চাইলেন, তোমার কী খেতে ইচ্ছা করে? সে বলল, আমি আটার রুটি খেতে চাই। সে সময় এটা যোগান দেয়া কঠিন ব্যাপার ছিল। তাঁর কথা শুনে হুযূর (সঃ) বলেন, কারও নিকট আটার রুটি থাকলে তার এ ভাইকে দিয়ে দাও। পরে নবী করীম (সঃ) বলেন, তোমাদের কোন রোগী যদি কিছু খেতে চায় তাহলে তাকে তা খাওয়াবে (সুনানে ইবনে মাজাহ্)। আবার এভাবে আর এক বর্ণনায় এসেছে। হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন। নবী করীম (সঃ) রুগী দেখার জন্যে গেলেন। তোমার কী খেতে মন চায়? তিনি নিজেই বল্লেন, তুমি কি দুধ শকর দিয়ে মাখানো আটার রুটি খেতে পছন্দ কর। এ মিঠা রুটি খুবই স্বাদের হয়ে থাকে। এ রুগী বলল, হ্যাঁ। অতএব তিনি (সঃ) এ রুগীর জন্যে তার কাঙ্ক্ষিত রুটি সরবরাহ করার আদেশ দিলেন (সুনানে ইবনে মাজাহ্)।

কোন কোন ডাক্তার রুগীকে কোন কোন খাবার খেতে নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি (সঃ) রুগীর আকাঙ্ক্ষা পুরো করতে উপদেশ দিতেন। রুগীর খাদ্য এমনিতেই কম হয়ে থাকে। কতটা খেতে পারে একটা রুগী যাতে তার ক্ষতি হয়? যখন ডাক্তার বিধি-নিষেধ আরোপ করে তখন আরও দুর্বল করে দিয়ে থাকে। কিন্তু এখন ডাক্তাররাও এ দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন। রুগীরা যা খেতে চায় তাদেরকে তা খেতে দাও। কিন্তু আমাদের এখানে যে হাকীম আছেন তিনি এ

ব্যাপারে খুবই কঠোর । তার কোন ঔষধ খেলেই একটি নিষিদ্ধ খাদ্য তালিকা দিয়ে দেন। সে সব না খেয়ে এতে সাবধানতা অবলম্বন করলে রুগীও থাকবে না আর রোগও থাকবেনা। আবার রোগীদের রোগ আরোগ্যের জন্যে দোয়ার সূক্ষ্ম-তত্ত্ব তিনি (সঃ) শিখিয়েছেন। সুতরাং হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলে করীম (সঃ) একজন মুসলমান রুগীকে দেখতে যান। রোগের কারণে সে অনেক দুর্বল হয়ে মুরগীর বাচ্চার ন্যায় হয়ে গিয়েছিল। খুবই কৃশ হয়ে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি কি দোয়া করে থাক? সে জবাব দিল, হ্যাঁ । সে বল্লো, আমি এ দোয়া করি, হে আল্লাহ্ ! যে শাস্তি তুমি আখেরাতে দিবে তা এখানেই দিয়ে দাও। এ শুনে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, সুবহানাল্লাহ্। সুবহানাল্লাহ্। তুমি তো এর শক্তিই রাখ না। তুমি এ দোয়া কেন কর না। আল্লাহুম্মা আতেনা ফিদ্দুনিয়া ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়া কিনা আযাবান্নার অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি এ দুনিয়াতেও মঙ্গল দান কর এবং আখেরাতেও মঙ্গল দান কর আর আমাকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর। বর্ণনাকারী বলেন, সে এ দোয়া করলে আল্লাহ্তাআলা তাকে আরোগ্য দান করেন (মুসলিম কিতাবুয্ যিক্‌র)। তাই সব সময় আল্লাহ্তাআলার কাছে থেকে দু'জাহানের মঙ্গল কামনা করা উচিত।

যেভাবে আমি বলেছিলাম, যেখানে দৈহিক রোগ-ব্যাধি দেখে তিনি (সঃ) অস্থির হয়ে যেতেন, সান্ত্বনা দিতেন, দোয়া করতেন সেখানে আধ্যাত্মিক রুগীদের জন্যেও অস্থির হতেন। আর যার সাথে কোন সম্পর্ক থাকতো তার জন্যে তো বিশেষভাবে খুবই দরদের সাথে আবেগাপ্লুত হতেন। চেষ্টা এই হতো সে-ও যেন পবিত্র আত্মার অধিকারী হয়ে যায়। আর যখন আল্লাহ্তাআলার সমীপে উপস্থিত হয় তখন তাঁর কৃপা দৃষ্টি যেন তার ওপর পড়ে।

এক হাদীসে একটি ঘটনা এসেছে। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন। এক ইহুদী ছেলে আঁ হযরত (সঃ)-এর সেবক ছিল। তার অসুখ হয়। আঁ হযরত (সঃ) তাকে দেখতে যান। তার বিছানায় বসে তার খোঁজ-খবর নেন। আর ইসলাম গ্রহণ করার তাহ্রিক করেন। ছেলেটি তার পিতার দিকে তাকালো। সে পাশেই বসে ছিল। তার পিতা বললো, আবুল কাসেম এর কথা মেনে নাও। এটা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এক উপাধি। সুতরাং সে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। হুযূর (সঃ) এ সুসংবাদ নিয়ে সেখান থেকে ফিরে এলেন। সব প্রশংসা সেই মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ্র যিনি এ ছেলেটিকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেছেন (বুখারী, কিতাবুল্ জানায়েয)।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ প্রসঙ্গে আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, রুগী দেখার সময়ে গোলমাল করবে না এবং রুগীর কাছে অনেকক্ষণ ধরে বসবে না। কম সময় বসা সুন্নত। রুগীর কামরায় গন্ডগোল করা, ভীড় লাগানো, অনেক সময় ধরে বসে না থাকা তাঁর (সঃ) সুন্নত (মিশকাতুল মাসাবিহ)। রুগী দেখার পরে ফিরে আসা উচিত। আর ঘরের লোকদের, যারা পরিচর্যা করেন তাদের সেখানে থাকা উচিত। হাসপাতালে থাকলে হাসপাতালের ব্যবস্থাপক ব্যবস্থা করবেন। কখনও কখনও নিকটাত্মীয়রা হাসপাতালেও ভীড় জমিয়ে থাকে। ছেলে পেলে ও তাদের চিৎকারে অন্যান্য রোগীদের কষ্ট হয়ে থাকে। আবার এমতাবস্থায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ করতে হয়। আমাদের সমাজে সাধারণত ভীড় করার অভ্যাস রয়েছে। কখনও কখনও রুগীর কাছে অধিক ভীড় করার কারণে লোকদের শ্বাস-প্রশ্বাসে পরিবেশ স্বচ্ছ থাকে না। এতে রুগীর কষ্ট বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই তাঁকে দেখুন। আমাদের সামনে আগেই তাঁর নমুনা ও আদর্শ উপস্থাপন করে দিয়েছেন। **রুগী দেখতে যাও, তাকে সান্ত্বনা দাও। তার জন্যে দোয়া কর এবং ফিরে আস। সেখানে বসে বসে আড্ডা জমিও না। এ দিকে রোগীর ঘরানার লোকদেরও বেশি ভীড় জমানো ঠিক নয়। যারা তার পরিচর্যা করছে তাদের কথা ভিন্ন।** আবার তিনি তাঁর উম্মতকে এ গুণ আত্মস্থ করার জন্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একটি বর্ণনায় এসেছে। হযরত আবূ হুরায়রা বর্ণনা করেন। আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন, হে ইবনে আদম! আমি রোগাক্রান্ত হয়েছিলাম। তুমি আমাকে দেখতে যাও নি। এর ওপর সে জবাব দিবে, হে রব্বুল আলামীন! তুমি কি করে রোগাক্রান্ত হতে পার, আর আমি কিভাবে তোমাকে দেখতে যেতে পারি? আল্লাহ্ বলবেন, তোমার কি জানা নেই, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল আর তুমি তাকে দেখতে যাও নি? তুমি কি এটা বুঝনি যে, তুমি তাকে দেখতে গেলে তুমি আমাকে তার কাছে পেতে? আর তাকে দেখলেই আমাকে দেখা হতো? (মুসলিম, কিতাবুল্ বির্‌র্)।

অতএব রুগীদের দেখতে যাওয়াও খোদাতাআলাকে পাওয়ার একটি মাধ্যম। এদিকে আমাদের দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক; বিশেষভাবে যারা অংগ সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত। আমি সব সময় তাদেরকে বলি, **লাজনা, খোদ্দাম ও আনসারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এমন কর্মসূচী গ্রহণ করে যেন রুগীদের দেখতে হাসপাতালে যায়। আপন পর ভেদে সবাইকে দেখা উচিত।** এটাও সঠিক সুন্নত অনুযায়ী হবে। আর সব সময় এ চেষ্টায় থাকা উচিত যেন আল্লাহ্তাআলার নৈকট্য লাভ করার জন্যে এ পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করি। আঁ হযরত (সঃ) আমাদেরকে এ কথাও বলে দিয়েছেন, কিভাবে আমরা রুগী দেখব। তিনি (সঃ) বলেছেন, **রুগী দেখার একটি উত্তম পদ্ধতি এই, তার নিকট যান, তার কপালে ও শরীরে হাত রাখুন।** তার অবস্থা কেমন তা জিজ্ঞেস করুন। তার সাথে দেখা করার একটা উত্তম পদ্ধতি এই ঃ পরস্পরে মোলাকাত বা করমর্দন করুন। এভাবে একে অপরের সাথে ভালবাসার অনুভূতি আরও বেড়ে যাবে (তিরমিযী)।

আর এক বর্ণনায় এটাও এসেছে। তিনি (সঃ) সাহাবাদেরকে আদেশ দিয়েছেন, রুগীদের সাথে দেখা করতে যাও। অতএব আমাদের সকলের এ আদেশ পালন করা কর্তব্য।

আবার তিনি (সঃ) বলেছেন, যখন কোন রুগীকে দেখতে যাও বা কারও জানাযায় অংশ গ্রহণ কর তখন মুখে ভাল ভাল কথা উচ্চারণ কর। কেননা, ফিরিশতা তোমাদের কথার ওপর 'আমীন' বলে থাকেন। তাই সেখানে ভাল ভাল কথা বল, দোয়া কর।

আবার রুগী দেখার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির জন্যে তিনি (সঃ) বলেন। এর বর্ণনা করেছেন হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)। আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রুগী দেখতে যায়, বা

হুযূর (সঃ) বল্লেন, তোমার কী হয়েছে? উম্মে সাহেব জবাবে বল্লেন, জ্বর। খোদা একে ধ্বংস করুন! নবী করীম (সঃ) বলেন, থাম, জ্বরকে গালি দিও না। কেননা, এটা মু'মিনের ত্রুটি-বিচ্যুতি এমনভাবে দূর করে দেয় যেভাবে ভাটি (আগুনের তাপ) সোনার নোংরা ময়লা দূর করে দেয় (আল্ আদাবুল্ মুফার্‌রাদ)। যদিও দোয়া অবশ্যই করা উচিত। আল্লাহ্‌তাআলা যেন আরোগ্য দান করেন। কিন্তু এভাবে রোগকে গালি-গালায করা উচিত নয়। আল্লাহ্‌র সাহায্য চাওয়া উচিত।

আর এ রোগের ওপর ধৈর্য ধারণের নির্দেশ কেবল অন্যদের জন্যে ছিল না বরং নিজেও কখনও অসুস্থ হলে বা কষ্ট পেলে সবচেয়ে বেশি ধৈর্য দেখাতেন।

তাঁর (সঃ) রোগকালীন এক ঘটনার উল্লেখ এসেছে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন। এমন অবস্থায় নবী করীম (সঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম যে, হুযূর (সঃ) চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলেন। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) তাঁর চাদরের ওপর থেকে প্রবল জ্বর অনুভব করলেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ)! কোন কোন লোকের এমন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। আঁ হুযূর (সঃ) বলেন, নবীদের, এর পর সালেহীনদের। আর নেক লোকদের কাউকে তো অভাব-অনটন দিয়ে পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। আর অভাবের কারণে কখনও তার পরার জন্যে কেবল একটি জুব্বাই থাকে যা দিয়ে তার পরার ও গায়ে দেয়ার কাজ সমাধা হয়ে থাকে। আবার কখন তাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। আর এমন অধিক হয় যে, তাকে নিহত করেই দেয়া হয়। আর এদের প্রত্যেকেই এতে এমনভাবে খুশী হয় যেভাবে তোমরা কোন কিছু পেলে খুশী হয়ে থাক (আল্ আদাবুল মুফার্‌রদ)। এটা ছিল তাঁর (সঃ) উত্তম আদর্শ। রোগীর ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্‌তাআলার দরবারে বেশি বেশি করে ঝুঁকে থাকা আবশ্যক। নবীরা তো পবিত্র হয়ে থাকেন। আর তিনি (সঃ) তো সবচেয়ে বেশি পবিত্র ছিলেন। তিনি (সঃ) বলেছেন, আমার শয়তান তো মুসলমান হয়ে গেছে। তাই নবীদের যে অসুখ হয়, জ্বর হয় তা পাপ মুক্তির জন্যে নয়। বরং ধৈর্য ও সন্তুষ্টির একটি দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্যে হয়ে থাকে। এতে মান্যকারীরা জানতে পারে ইনি কেবল উপদেশই দেন না বরং নিজেও এর ওপর আমল করেন এবং ধৈর্য ও সন্তুষ্টির নমুনা দেখান।

আঁ হযরত (সঃ)-এর আদর্শের ওপর চলতে ও চলতে থেকে তাঁর সাহাবারাও অসুস্থাবস্থায় দোয়ার ওপর জোর দিতেন আর এ পদ্ধতিই আমাদের নিকট ছড়িয়ে দিতেন।

আব্দুল আযীয বর্ণনা করেন। আমি ও সাবেত আনাস বিন মালেক (রাঃ)-কে দেখতে গেলাম। সাবেত বলেন, হে আবূ হামযা! আমি অসুস্থ। এতে হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি কি সে রকম ফুঁক দিব না যেভাবে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) রুগীকে দিয়ে থাকতেন? তিনি বলেন, কেন নয়? হযরত আনাস (রাঃ) এসব শব্দে ফুঁক দিলেন- আল্লাহুমা রব্বান্নাসি মুযহিবাল বা'সি ইশ্‌ফি আনতাশ্ শাফী লা শিফায়া ইল্লা আন্‌তা শিফায়া লা ইউগাদিরু সাক্বামা-হে আল্লাহ্! যিনি লোকদের প্রভু-

নবীদের যে অসুখ হয়, জ্বর হয় তা পাপ মুক্তির জন্যে নয়। বরং ধৈর্য ও সন্তুষ্টির একটি দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্যে হয়ে থাকে। এতে মান্যকারীরা জানতে পারে ইনি কেবল উপদেশই দেন না বরং নিজেও এর ওপর আমল করেন এবং ধৈর্য ও সন্তুষ্টির নমুনা দেখান।

প্রতিপালক, হে সেই সত্তা যিনি কষ্টকে দূর করে দিয়ে থাক, আরোগ্য দান কর, তুমিইতো আরোগ্যদানকারী। কেননা, তুমিই আরোগ্য দান করে থাক। তুমি ছাড়া আরোগ্যদানকারী কেউ নেই। একে এমন আরোগ্য দান কর যেন রোগের কোন প্রভাব অবশিষ্ট না থাকে।

তাই রোগীকে স্বয়ং নিজের রোগের জন্যে দোয়া করা উচিত। নিজের রোগকে গালি-গালায করা উচিত নয়। অন্য রোগীকে দেখতে গেলে তার জন্যেও দোয়া করা উচিত। আর এভাবে দোয়ার সাথে সদকা-খয়রাতও করা উচিত। আঁ হযরত (সঃ) এ প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অতএব একটি বর্ণনায় এসেছে। তিনি (সঃ) বলেছেন, নিজের রুগীর চিকিৎসা সদকা-খয়রাত দিয়ে কর। এটা তোমাদের রোগ-ব্যাধি এবং ভবিষ্যত পরীক্ষাকে দূরীভূত করে থাকে। রোগের অবস্থায় সদকা-খয়রাতের আদেশ রয়েছে। এ-ও এক প্রকার প্রতিকার। আবার রোগ-ব্যাধি ও বালা-মুসিবত থেকে সুরক্ষার জন্যে এভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সদকা-খয়রাত করতে থাক। কেননা, ছোট-খাট পরীক্ষা এলে দোয়া ও সদকা খয়রাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তাআলাই এর কুফল থেকে রক্ষা করে থাকেন। আবার তিনি রোগী দেখার সময় রোগীর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী খাবার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিতেন। রুগীর ব্যাপারে এমন কোন বিষয় নেই যা তিনি (সঃ) ছেড়ে দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে একটি বর্ণনায় এসেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন। হযরত নবী করীম (সঃ) এক রোগী দেখতে গিয়ে তার কাছে জানতে চাইলেন, তোমার কী খেতে ইচ্ছা করে? সে বলল, আমি আটার রুটি খেতে চাই। সে সময় এটা যোগান দেয়া কঠিন ব্যাপার ছিল। তাঁর কথা শুনে হুযূর (সঃ) বলেন, কারও নিকট আটার রুটি থাকলে তার এ ভাইকে দিয়ে দাও। পরে নবী করীম (সঃ) বলেন, তোমাদের কোন রোগী যদি কিছু খেতে চায় তাহলে তাকে তা খাওয়াবে (সুনানে ইবনে মাজাহ্)। আবার এভাবে আর এক বর্ণনায় এসেছে। হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন। নবী করীম (সঃ) রুগী দেখার জন্যে গেলেন। তোমার কী খেতে মন চায়? তিনি নিজেই বল্লেন, তুমি কি দুধ শকর দিয়ে মাখানো আটার রুটি খেতে পছন্দ কর। এ মিঠা রুটি খুবই স্বাদের হয়ে থাকে। এ রুগী বলল, হ্যাঁ। অতএব তিনি (সঃ) এ রুগীর জন্যে তার কাঙ্ক্ষিত রুটি সরবরাহ করার আদেশ দিলেন (সুনানে ইবনে মাজাহ্)।

কোন কোন ডাক্তার রুগীকে কোন কোন খাবার খেতে নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি (সঃ) রুগীর আকাঙ্ক্ষা পুরো করতে উপদেশ দিতেন। রুগীর খাদ্য এমনিতেই কম হয়ে থাকে। কতটা খেতে পারে একটা রুগী যাতে তার ক্ষতি হয়? যখন ডাক্তার বিধি-নিষেধ আরোপ করে তখন আরও দুর্বল করে দিয়ে থাকে। কিন্তু এখন ডাক্তাররাও এ দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন। রুগীরা যা খেতে চায় তাদেরকে তা খেতে দাও। কিন্তু আমাদের এখানে যে হাকীম আছেন তিনি এ

ব্যাপারে খুবই কঠোর । তার কোন ঔষধ খেলেই একটি নিষিদ্ধ খাদ্য তালিকা দিয়ে দেন। সে সব না খেয়ে এতে সাবধানতা অবলম্বন করলে রুগীও থাকবে না আর রোগও থাকবেনা। আবার রোগীদের রোগ আরোগ্যের জন্যে দোয়ার সূক্ষ্ম-তত্ত্ব তিনি (সঃ) শিখিয়েছেন। সুতরাং হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলে করীম (সঃ) একজন মুসলমান রুগীকে দেখতে যান। রোগের কারণে সে অনেক দুর্বল হয়ে মুরগীর বাচ্চার ন্যায় হয়ে গিয়েছিল। খুবই কৃশ হয়ে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি কি দোয়া করে থাক? সে জবাব দিল, হ্যাঁ । সে বল্লো, আমি এ দোয়া করি, হে আল্লাহ্ ! যে শাস্তি তুমি আখেরাতে দিবে তা এখানেই দিয়ে দাও। এ শুনে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, সুবহানাল্লাহ্। সুবহানাল্লাহ্। তুমি তো এর শক্তিই রাখ না। তুমি এ দোয়া কেন কর না। আল্লাহুম্মা আতেনা ফিদ্দুনিয়া ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়া কিনা আযাবান্নার অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি এ দুনিয়াতেও মঙ্গল দান কর এবং আখেরাতেও মঙ্গল দান কর আর আমাকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর। বর্ণনাকারী বলেন, সে এ দোয়া করলে আল্লাহ্তাআলা তাকে আরোগ্য দান করেন (মুসলিম কিতাবুয্ যিক্‌র)। তাই সব সময় আল্লাহ্তাআলার কাছে থেকে দু'জাহানের মঙ্গল কামনা করা উচিত।

যেভাবে আমি বলেছিলাম, যেখানে দৈহিক রোগ-ব্যাধি দেখে তিনি (সঃ) অস্থির হয়ে যেতেন, সান্ত্বনা দিতেন, দোয়া করতেন সেখানে আধ্যাত্মিক রুগীদের জন্যেও অস্থির হতেন। আর যার সাথে কোন সম্পর্ক থাকতো তার জন্যে তো বিশেষভাবে খুবই দরদের সাথে আবেগাপ্লুত হতেন। চেষ্টা এই হতো সে-ও যেন পবিত্র আত্মার অধিকারী হয়ে যায়। আর যখন আল্লাহ্তাআলার সমীপে উপস্থিত হয় তখন তাঁর কৃপা দৃষ্টি যেন তার ওপর পড়ে।

এক হাদীসে একটি ঘটনা এসেছে। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন। এক ইহুদী ছেলে আঁ হযরত (সঃ)-এর সেবক ছিল। তার অসুখ হয়। আঁ হযরত (সঃ) তাকে দেখতে যান। তার বিছানায় বসে তার খোঁজ-খবর নেন। আর ইসলাম গ্রহণ করার তাহ্রিক করেন। ছেলেটি তার পিতার দিকে তাকালো। সে পাশেই বসে ছিল। তার পিতা বললো, আবুল কাসেম এর কথা মেনে নাও। এটা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এক উপাধি। সুতরাং সে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। হুযূর (সঃ) এ সুসংবাদ নিয়ে সেখান থেকে ফিরে এলেন। সব প্রশংসা সেই মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ্র যিনি এ ছেলেটিকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেছেন (বুখারী, কিতাবুল্ জানায়েয)।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ প্রসঙ্গে আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, রুগী দেখার সময়ে গোলমাল করবে না এবং রুগীর কাছে অনেকক্ষণ ধরে বসবে না। কম সময় বসা সুন্নত। রুগীর কামরায় গন্ডগোল করা, ভীড় লাগানো, অনেক সময় ধরে বসে না থাকা তাঁর (সঃ) সুন্নত (মিশকাতুল মাসাবিহ)। রুগী দেখার পরে ফিরে আসা উচিত। আর ঘরের লোকদের, যারা পরিচর্যা করেন তাদের সেখানে থাকা উচিত। হাসপাতালে থাকলে হাসপাতালের ব্যবস্থাপক ব্যবস্থা করবেন। কখনও কখনও নিকটাত্মীয়রা হাসপাতালেও ভীড় জমিয়ে থাকে। ছেলে পেলে ও তাদের চিৎকারে অন্যান্য রোগীদের কষ্ট হয়ে থাকে। আবার এমতাবস্থায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ করতে হয়। আমাদের সমাজে সাধারণত ভীড় করার অভ্যাস রয়েছে। কখনও কখনও রুগীর কাছে অধিক ভীড় করার কারণে লোকদের শ্বাস-প্রশ্বাসে পরিবেশ স্বচ্ছ থাকে না। এতে রুগীর কষ্ট বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই তাঁকে দেখুন। আমাদের সামনে আগেই তাঁর নমুনা ও আদর্শ উপস্থাপন করে দিয়েছেন। **রুগী দেখতে যাও, তাকে সান্ত্বনা দাও। তার জন্যে দোয়া কর এবং ফিরে আস। সেখানে বসে বসে আড্ডা জমিও না। এ দিকে রোগীর ঘরানার লোকদেরও বেশি ভীড় জমানো ঠিক নয়। যারা তার পরিচর্যা করছে তাদের কথা ভিন্ন।** আবার তিনি তাঁর উম্মতকে এ গুণ আত্মস্থ করার জন্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একটি বর্ণনায় এসেছে। হযরত আবূ হুরায়রা বর্ণনা করেন। আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন, হে ইবনে আদম! আমি রোগাক্রান্ত হয়েছিলাম। তুমি আমাকে দেখতে যাও নি। এর ওপর সে জবাব দিবে, হে রব্বুল আলামীন! তুমি কি করে রোগাক্রান্ত হতে পার, আর আমি কিভাবে তোমাকে দেখতে যেতে পারি? আল্লাহ্ বলবেন, তোমার কি জানা নেই, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল আর তুমি তাকে দেখতে যাও নি? তুমি কি এটা বুঝনি যে, তুমি তাকে দেখতে গেলে তুমি আমাকে তার কাছে পেতে? আর তাকে দেখলেই আমাকে দেখা হতো? (মুসলিম, কিতাবুল্ বির্‌র্)।

অতএব রুগীদের দেখতে যাওয়াও খোদাতাআলাকে পাওয়ার একটি মাধ্যম। এদিকে আমাদের দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক; বিশেষভাবে যারা অংগ সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত। আমি সব সময় তাদেরকে বলি, **লাজনা, খোদ্দাম ও আনসারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এমন কর্মসূচী গ্রহণ করে যেন রুগীদের দেখতে হাসপাতালে যায়। আপন পর ভেদে সবাইকে দেখা উচিত।** এটাও সঠিক সুন্নত অনুযায়ী হবে। আর সব সময় এ চেষ্টায় থাকা উচিত যেন আল্লাহ্তাআলার নৈকট্য লাভ করার জন্যে এ পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করি। আঁ হযরত (সঃ) আমাদেরকে এ কথাও বলে দিয়েছেন, কিভাবে আমরা রুগী দেখব। তিনি (সঃ) বলেছেন, **রুগী দেখার একটি উত্তম পদ্ধতি এই, তার নিকট যান, তার কপালে ও শরীরে হাত রাখুন।** তার অবস্থা কেমন তা জিজ্ঞেস করুন। তার সাথে দেখা করার একটা উত্তম পদ্ধতি এই ঃ পরস্পরে মোলাকাত বা করমর্দন করুন। এভাবে একে অপরের সাথে ভালবাসার অনুভূতি আরও বেড়ে যাবে (তিরমিযী)।

আর এক বর্ণনায় এটাও এসেছে। তিনি (সঃ) সাহাবাদেরকে আদেশ দিয়েছেন, রুগীদের সাথে দেখা করতে যাও। অতএব আমাদের সকলের এ আদেশ পালন করা কর্তব্য।

আবার তিনি (সঃ) বলেছেন, যখন কোন রুগীকে দেখতে যাও বা কারও জানাযায় অংশ গ্রহণ কর তখন মুখে ভাল ভাল কথা উচ্চারণ কর। কেননা, ফিরিশতা তোমাদের কথার ওপর 'আমীন' বলে থাকেন। তাই সেখানে ভাল ভাল কথা বল, দোয়া কর।

আবার রুগী দেখার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির জন্যে তিনি (সঃ) বলেন। এর বর্ণনা করেছেন হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)। আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রুগী দেখতে যায়, বা

আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টির খাতিরে কোন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায় তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন আহ্‌বানকারী-এ আহ্বান করে থাকেন। তুমি সন্তুষ্ট হও, তোমার যাওয়া বরকতমন্ডিত হোক, জান্নাত তোমার ঠিকানা হোক! (তিরমিযী)। আসলে তো একজন মানুষের জন্যে আর একজন মানুষের সহানুভূতি ও পুণ্য আবেগ প্রকাশের কারণে এ ঘোষণা। অতএব এ আবেগকে বিস্তার দানের জন্যে চেষ্টা করা উচিত। তখনই আমরা আঁ হযরত (সঃ)-এর আদর্শের ওপর চলবো।

রুগী দেখার ব্যাপারে আঁ হযরত (সঃ)-এর বর্ণনার কয়েকটি আমি উল্লেখ করছি। তিনি রুগীদের ব্যাপারে কতটা চিন্তা করতেন। এটা একথার আরও প্রমাণ যে, তাদের চিকিৎসার, তাদের পথ্য প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখতেন। আর কোন কোন রোগের চিকিৎসাও করতেন।

হযরত উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন। আমি নবী করীম (সঃ)-কে একথা বলতে শুনেছি, কালজিরার মাঝে কেবল মৃত্যু ছাড়া সব রোগের ঔষধ রয়েছে। এ ব্যবস্থাপত্র তিনি তাঁর প্রিয়দের দিতেন (বুখারী কিতাবুত্ত্বিব)। বলতেন, কোন কোন রোগের ঔষধ হিসেবে এটা খাও। ব্যথা, বেদনার জন্যে এটা ভাল ঔষধ।

আবার একবার হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সঃ)-এর কাছে এসে বল্‌ল, আমার ভাইয়ের পেটে ব্যথা। নবী করীম (সঃ) বলেন, তাকে মধু পান করাও। সে আবার এসে বল্‌ল, ব্যথা ভাল হয় নি। তিনি বলেন, আবার মধু পান করাও। আবার সে আসলো, বলল, ব্যথা সারে নি। তখন তিনি (সঃ) বলেন, আবার মধু পান করাও। কিন্তু বার বার আসা ঠিক হয় নি। এর পর তিনি বল্‌লেন, সাদাকাল্লাহু ওয়া কাযাবা বাতনু আখিকা অর্থাৎ আল্লাহ্‌ সত্য বলেছেন কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলেছে। তাকে মধু পান করাও (বুখারী কিতাবুত্ত্বিব)। সে কিভাবে পান করিয়েছে জানা যায় নি। সে আবার মধু পান করিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সে ভাল হয়ে গেছে। মধু ও বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। আর ভিন্ন ভিন্ন রোগের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন মধু রয়েছে। আবার আর একটি ব্যবস্থাপত্র সম্বন্ধে জানা যায়। তিনি (সঃ) বলেছেন, ডুমুর খাও। ফল-ফলাদির মাঝে খুবই ভাল ফল। জান্নাত থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এমন একটি ফলের নাম আমি যদি বলি, ডুমুর জান্নাত থেকে এসেছে। এমন ফল যাতে আঁটি নেই। অতএব এ খাও। কেননা , এটা অর্শ রোগ দূর করে আর গেঁটে বাত রোগের জন্যেও উপকারী (কনযুল উম্মাল, কিতাবুত্ত্বিব)। যাদের গেঁটে বাতের কষ্ট রয়েছে তাদের জন্যে ভাল।

পুনরায় আর একটি ব্যবস্থার উল্লেখ এসেছে কিসমিসের ব্যাপারে। এটা ব্যবহার করা উচিত। কেননা, এটা অরুচি দূর করে। সর্দি দূর করে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুদৃঢ় করে। শীর্ণতা দূর করে। চরিত্রকে ভাল করে। হৃদপিন্ডকে সুস্থ রাখে এবং দুঃখ দূর করে দেয় (কনযুল উম্মাল, কিতাবুত্ত্বিব)।

এ ব্যাপারে বড় বড় লোকেরা অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। কেউ কেউ গোলাপের নির্যাসে কিসমিস ভিজিয়ে খেয়েছেন এবং যাদের হৃৎপিন্ডের শিরা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর ডাক্তার বাই পাস অস্ত্রপচারের পরামর্শ দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র ফযলে তাদের শিরা খুলে গিয়েছে। এ অভিজ্ঞতার কথা কেউ আমাকে বলেছেন।

আবার যয়তুনের প্রসঙ্গে এসেছে। এ মালিশ করলে এতে শ্বেতকুষ্ঠ এবং এ জাতীয় আরও সত্তরটি রোগের আরোগ্য রয়েছে। এটা খেয়েও নাও (কনযুল উম্মাল, কিতাবুত্ত্বিব)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রোগীকে এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত ব্যক্তিকে মধু ও আটা থেকে তৈরী পাতলা ক্ষির খাওয়াবার জন্যে বলেছেন। তিনি (রাঃ) বললেন। কেননা, তিনি রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন, এটা হৃৎপিন্ডকে সুস্থ রাখে এবং তার দুঃখ কিছুটা লাঘব করে দেয় (বুখারী, কিতাবুত্ত্বিব)।

পুনরায় খেজুর প্রসঙ্গে বলেছেন। এটাও খাওয়া উচিত। কেননা, এটা শূল ব্যথা দূর করে। মোটকথা অপরিসীম ব্যবস্থাপত্র রয়েছে। এখানে আমি আরও একটি বিষয় বলে দিচ্ছি। হুযূর (সঃ) বলেছেন, গাভীর দুধ পান করা উচিত। কেননা, এটা ঔষধ। এর ক্রীম ও মাখনে আরোগ্য আছে। আর এর মাংস খাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। কেননা, এর মাংসে এক রকম রোগ-ব্যাধি রয়েছে (কনযুল উম্মাল, কিতাবুত্ত্বিব)।

তাই একথা এখন প্রমাণিত যে, গো-মাংস যারা অধিক পরিমাণে খেয়ে থাকেন তাদেরকে নানা প্রকার রোগ-ব্যাধি আক্রমণ করে। যেমন, যে সব রুগীর ইউরিক এসিড হয়, গেঁটে বাত, বাতের কষ্ট হয় তাদেরকে ডাক্তার গো-মাংস খেতে নিষেধ করেন। আবার অন্যান্য কোন কোন রোগ আছে তা-ও হতে পারে। কোন বিশেষ রুগীকে কোন বিশেষ কারণে পরামর্শ দিতে হয় তো বলা হয় সম্ভবত সেখানে মাংস অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার রক্ত চাপের রুগীকেও এবং হৃদ রোগীকেও ডাক্তার গো-মাংস খেতে নিষেধ করে থাকেন। তাই দেখুন আজ থেকে ১৪শ' বছর আগে তিনি (সঃ) এসব কথা বলে দিয়েছেন যা আজকাল গবেষণায় জানা যাচ্ছে (যতটা চর্বির সাথে সম্পর্ক এটা এখনও পরিষ্কার নয় যে, এতে কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কোন পুষ্টি বিজ্ঞানীই বলতে পারেন)। কারও যদি জানা থাকে গাভীর চর্বিতে কি উপকার হয়ে থাকে আর কোথাকার চর্বি উপকারী তাহলে তা জানার জন্যে চেষ্টা করুন। যেভাবে তিনি (সঃ) বলেছেন, আর একটি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তাই যেভাবে আমি বলেছি, তিনি চিকিৎসার ক্ষেত্রে দিয়ে থাকতেন এমন প্রচুর ব্যবস্থাপত্র রয়েছে। এখন তো সেগুলো বর্ণনা করার সময়ও নেই। আর এসব কিছু কেবল সৃষ্টির সাথে তাঁর অগাধ ভালবাসার কারণেই ছিল। তাঁর প্রাণ এ সহানভূতিতে ভরপুর ছিল। এ কারণেই, কিভাবে আল্লাহ্‌তাআলার সৃষ্টির উপকার করা যায় তিনি সব সময় সে চেষ্টায়ই রত থাকতেন।

আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ সালাম হোক সেই পবিত্র নবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি! আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকেও এ আদর্শ অনুসরণ করার এবং এসব উপদেশ অনুযায়ী পথ চলার সৌভাগ্য দান করুন যাতে আমরাও সৃষ্টির সেবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারি।
(ওডিও ক্যাসেট থেকে শুনে)

অনুবাদ - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

প্রত্যেক আহমদী অন্যের দুর্বলতাকে ঢেকে রাখবে। কেউ কারো ত্রুটি খুঁজবে না।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) গত ১১ই নভেম্বর ২০০৪ইং তারিখে বায়তুল ফুতূহ্ লন্ডনে খুতবা প্রদান করেছেন।

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করে হুযূর (আইঃ) খুতবা এরশাদ করেছেন।

ইসলাম আমাদেরকে পরস্পর মিলেমিশে জীবন যাপন করতে এবং উন্নত চরিত্রের বিকাশ ঘটানোর উপর জোর দিয়েছে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে আল্লাহ্ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, নিজেদের মধ্যে উত্তম চরিত্র সৃষ্টি কর, নিজেরা পরস্পর ভালবাসা ও মহব্বতের সাথে থাক। একে অপরের হক আদায় কর। মানুষের মধ্যে ভুল-ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়ে থাকে তাই বলে নিজেদের সাথীদের, নিজেদের বন্ধুদের, নিজেদের শুভাকাংখীদের অথবা নিজেদের সমাজের লোকদের ভুল-ত্রুটির অন্বেষণে সর্বদা লেগে থেকো না। আর এভাবে গোয়েন্দাগিরি করো না যে, কোন ভাবে কারো ভুল ধরব এবং পরবর্তীতে তা নিয়ে বলাবলি করতে থাকব। এটা একটা বৃথা ও অহেতুক কাজ। এই দোষ-ত্রুটি অন্বেষণকারী ব্যক্তি অথবা দোষত্রুটি অন্বেষণের আকাংখী ব্যক্তি সাধারণত হয় কোন ভুল ধরে আর যার ভুল ধরেছে তাকে ব্লেকমেইল করার চেষ্টা করে, তার দ্বারা কোন কাজ করে নেওয়ার চেষ্টা করে, যে কোন ফায়দা উঠানোর চেষ্টা করে। ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে এ কাজ করা হয়ে থাকে। এ জন্য বড় ধরনের অন্যায় পথ অবলম্বন করা হয়। আর এভাবেই কতক লোকদেরকে তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যখন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ কাজ করা হয় ব্যক্তিগতভাবে সমাজের মাঝে এমন কিছু লোক থাকে যারা মানুষের দোষ খুঁজে বেড়ায় যেন তাদের বদনাম করা যায়। কত কত জালেম তো এভাবে অনেকের দুর্বলতা অন্বেষণ করে অথবা দুর্বলতা না থাকলেও কথা বাড়িয়ে বাড়িয়ে মেয়েদের বিয়ের প্রস্তাব দিতেও দ্বিধা করে না, এর থেকে বিরতও হয় না। অপর পক্ষের কাছে গিয়ে অনেক সময় যেখানে বিয়ের কথাবার্তা চলছে সেখানে এমনভাবে অসত্য কথা বলে বসে যে, সে তখন চিন্তায় পড়ে যায় যে, আমি সম্পর্ক করব কী করব না। উদ্দেশ্যে কেবল এটাই হয়ে থাকে যে, মেয়ের মা, বাবা, আত্মীয়-স্বজনকে কষ্টে ফেলে দেওয়া যাক। কতিপয় লোক শুধুমাত্র মজা করার জন্য, হাসি ঠাট্টার ছলে কারো দুর্বলতাগুলোকে তুলে ধরে এবং আজকাল সমাজে এই ধরনের কষ্টদায়ক অবস্থা কিছু বেশি দেখা যাচ্ছে। হতে পারে এ কারণে যে, পারস্পরিক যোগাযোগ সহজ হয়ে গেছে। যা হোক বিশেষ কোন ফায়দা উঠানোর জন্যই হোক অথবা কারো বদনাম করার জন্যই হোক অথবা জিহ্বার মজার জন্যই হোক অপরের দুর্বলতা ও ভুলত্রুটিকে তুলে ধরা হয়। অনেক সময় এমন অবস্থা সৃষ্টি করা হয় যে, কোন ভুল কারো দ্বারা করিয়ে নেওয়া হয় এবং পুনরায় ঐ ভুলকেই ধরে তার দ্বারা ফয়দা উঠানো হয়। এ অবস্থায় যেভাবে আমি বলেছি, কেবল ইসলামের মান্যকারীকে এটা বলে যে, এ সব অযথা বেহুদা কর্ম থেকে বাঁচ। আর এ যুগে প্রকৃত ইসলামের নমুনা প্রদর্শনকারী ব্যক্তি যদি কেউ হতে চায় বা হয়ে থাকে তা কেবল আহমদীরাই। এ কারণে সকল আহমদীর জন্য এটা ফরজ হয়ে পড়েছে যে, দোষ-ত্রুটি এবং ভুল অন্বেষণ করা তো দূরের কথা যদি কারো কোন ভুল অনিচ্ছা সত্ত্বেও জানা যায় তো তা গোপন করাও আবশ্যক। কেননা, প্রত্যেকেরই একটি সম্মানবোধ আছে, সে বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখা উচিত। অপরের যদি কোন দোষ-ত্রুটি থেকে থাকে, তাহলে তা প্রকাশে এক তো তার জন্য বদনামীর কারণ হচ্ছে আর অন্যান্যদেরও এই মন্দের অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায়। তখন ধীরে ধীরে মন্দের বলাবলি শুরু হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে সমাজের লোকজনও এই মন্দকথা বলাবলিতে লিপ্ত হয়ে যায়। এজন্য আমার পরিষ্কার নির্দেশ যে কথায় সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় অথবা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে, সে কথা ঘোষণা করো না বা প্রকাশ করো না, তা ছড়িও না, দোয়া কর এবং মন্দ থেকে এক দিকে সরে যাও। আর যদি

আমার পরিষ্কার নির্দেশ যে কথায় সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় অথবা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে, সে কথা ঘোষণা করো না বা প্রকাশ করো না, তা ছড়িও না, দোয়া কর এবং মন্দ থেকে এক দিকে সরে যাও। আর যদি কারো প্রতি সহানুভূতি থেকে থাকে তবে দোয়া এবং সামনা-সামনি বুঝিয়ে ঐ মন্দকে দূর করার চেষ্টা করাই সবচে উত্তম পন্থা।

কারো প্রতি সহানুভূতি থেকে থাকে তবে দোয়া এবং সামনা-সামনি বুঝিয়ে ঐ মন্দকে দূর করার চেষ্টা করাই সবচে উত্তম পন্থা। যদি জামাতের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনে থাক, যাতে জামাতের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তবে এ সম্পর্কে যুক্ত কর্মকর্তাদেরকে অথবা আমার পর্যন্ত এই কথা পৌঁছানো যেতে পারে। এদিকে ওদিকে কথা বলার কোন অধিকার নেই এবং কোন দরকারও নেই। এর দ্বারা মন্দ ছড়িয়ে থাকে। যদি উদাহরণস্বরূপ এরূপ ভুলকারী ব্যক্তির সংশোধন সম্ভব না হয় তাহলে অন্যরাও যাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে তারাও অনেক সময় এমন কথা বলে যাবে, নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করতে লেগে যাবে। কারণ তাদের মাথায় আছে যে, উমুক ব্যক্তির ভুল ধরে মজলিসে আমেলার মেম্বার অথবা অমুক ব্যক্তি কি করতে পেরেছে যে আমাদের বিরুদ্ধে করতে পারবে? ঐ ব্যক্তির কি ক্ষতি হয়েছে? জিহবার স্বাদ নেওয়ার জন্য কিছু কথা বলে নিই। পরে দেখা যাবে (কি হবে বা না হবে) এ ধরনের কথা অনিষ্ট ছড়িয়ে থাকে, পর্দা উঠে যায়।

সাধারণতঃ এটা তো এমন ধরণের লোকদের চিন্তার ত্রুটি ; তাকওয়ার অভাব। কিন্তু যে ব্যক্তির নেযাম বিরোধী কোন কথা কানে আসে, তার জন্য এটা ফরজও হয়ে পড়ে যে এ ধরণের কথা শুধু মাত্র নেযামে জামাতকে বলতে হবে এবং এদিক ওদিক যেন না করা হয়। কেননা অনেক সময় এমনও হয়ে থাকে যে, ঐ (কথা শোনা) ব্যক্তির কোন ভুল হয়ে যায়। অনেক সময় যে কথা বলে সে ব্যক্তি এখলাসে জামাত হওয়া সত্ত্বেও সাময়িক আবেগ তাড়িত হয়ে এমন ধরণের কোন কথা বলে বসে, যার কারণে পরবর্তীতে লাঞ্ছিত হয় এবং একবার শুনে ঐ কথা আগ বাড়িয়ে বলা লাঞ্ছিত হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। অনেক সময় কেউ সঠিক শব্দ আদায় করেনি তো এ কারণে এ কথাকে খুব বেশি ভয়ানক কথা বলে ধরা হয়ে থাকে। তো কোথাও এমন ধরনের দুর্বলতা হয়ে থাকলে তাকে আলাদা ডেকে বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে অথবা জামাতী কর্মকর্তাদেরকে বলা যেতে পারে যে, আমি এ ধরনের কথা শুনেছি আপনারা যাচাই করে নিন। কিন্তু কারো কোন ধরণের কথা কখনোই ছড়ানো উচিত নয়। যার দ্বারা কারো ইজ্জতের উপরে দাগ লাগে, হতে পারে যে কোন সময় এই অনিষ্ট বা ভুল আপনার দ্বারাই হয়ে যেতে পারে এবং যদি পরবর্তীতে প্রকাশ হতে থাকে আর বদনাম হতে থাকে তবে আপনার কেমন কষ্ট হবে? প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে চিন্তা করে কথা বলা উচিত।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, ইসলাম যে খোদাকে পেশ করেছে এবং মুসলমানরা যে খোদাকে মেনেছে, সে রহীম, (দয়ালু) করীম, (সম্মানিত) হালীম, (নম্র) তাওয়াব এবং গাফফার (তওবা কবুলকারী ও ক্ষমাশীল) যে ব্যক্তি সত্যিকার তওবা করে আল্লাহ্তাআলা তার তওবা কবুল করেন এবং তার পাপ ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পৃথিবীতে ভাই হলেও অথবা কোন নিকটাত্মীয় হোক না কেন যখন সে একবার দোষত্রুটি দেখে আর তার থেকে যদিও সে ফেরত আসে কিন্তু সে তাকে ত্রুটি যুক্তই (প্রাপ্য) মনে করে। কিন্তু আল্লাহ্তাআলা এমন দয়ালু যে মানুষ হাজারো দোষ করে ফিরে আসলেও তাকে তিনি ক্ষমা করে দেন। দুনিয়াতে কোন মানুষ এমন নেই শুধু নবী-রসূলগণ ব্যতীত (যারা আল্লাহ্তাআলার রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে থাকে)। চক্ষু দ্বারা এমন ধরনের কর্ম করে থাকে বরং সাধারণভাবে তো এমন অবস্থা যে, যা শেখ শাদী বলেছেন যে, খোদাতাআলা জেনেও

শেখ শাদী বলেছেন যে, খোদাতাআলা জেনেও গোপন রাখেন কিন্তু প্রতিবেশী সামান্য জেনেও তা ছড়িয়ে দেয়।

গোপন রাখেন কিন্তু প্রতিবেশী সামান্য জেনেও তা ছড়িয়ে দেয়। [হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন] "সুতরাং চিন্তা কর তাঁর দয়া ও কৃপা কত বড় গুণ। এটা একেবারেই সত্য যে যদি খোদা পাকড়াও করেন তবে সকলে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর দয়া ও কৃপা খুব বেশি প্রশস্ত এবং তাঁর ক্রোধের উপর প্রাধান্য পেয়ে থাকে।" সুতরাং দেখুন কিভাবে তিনি (আঃ) অন্যের গোপনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, আল্লাহ্তাআলা রহীম (দয়াময়) আর ঐ রহম সিফতের কারণে নিজ বান্দাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন। খুব বেশি দয়ালু, অনেক বেশি দানকারী, হালীম (নম্র) তওবা কবুল করে থাকেন। বান্দার জানা নেই যে কার সাথে আল্লাহ্ কি ব্যবহার করবেন। শেখ শাদীর কথা তিনি (আঃ) বলেছেন, যেভাবে আমি বলেছি যে আল্লাহ্তাআলা কতক লোকের মনের খবর জানা সত্ত্বেও বান্দার গোপনীয়তা রক্ষা করে থাকেন, কিন্তু সঙ্গী যার হতে পারে সব খবর জানা নাই। কোন একটি ত্রুটি নিয়ে, কোন একটি কথা নিয়ে, কোন একটি বাক্য নিয়ে কোন সময় কোন শব্দ নিয়েই কারো বদনাম করার জন্য সে চিৎকার শুরু করে যে তার সীমা থাকে না। এ জন্য সকলের এস্তেগফার করতে থাকা উচিত। কেননা যদি আল্লাহ্তাআলা হিসাব নিতে থাকেন তো বলেছেন যে, হতে পারে সকলেই এখানে ধরা পড়বে। কিন্তু তার রহম ও করম রয়েছে যার কারণে আমরা এখন জীবিত আছি।

একটি হদীসে এসেছে, রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তোমাদের প্রভুর নিকটবর্তী হবে। এমনকি তিনি তাঁর রহমতের ছায়া তার ওপর ঢালবেন, পরে বলবেন তুমি উমুক উমুক কাজ করেছ। সে বলবে হ্যাঁ আমার খোদা। আল্লাহ্ বলবেন ওমুক ওমুক কাজও করেছিলে? সে স্বীকারোক্তি দিবে। এরপর আল্লাহ্ বলবেন আমি ঐ দুনিয়ায় তোমার দুর্বলতাসমূহের গোপনীয়তা রক্ষা করেছি আজ কিয়ামতের দিনও গোপনীয়তা রক্ষা করছি আর ক্ষমা করছি।" (বুখারী কিতাবুল আদব)

পুনরায় অপর একটি রেওয়ায়েত হয়েছে, রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, "এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর যুলুম করে না, আর না তাকে একা অসহায় ছেড়ে দেয়। যে ব্যক্তি তার ভাই এর প্রয়োজন পূরণে লেগে থাকে আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পূর্ণ করে থাকেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কষ্ট দূর করেছে আল্লাহতাআলা কিয়ামতের দিন তার কষ্টসমূহ থেকে একটি কষ্ট কম করে দিবেন। আর যে কোন মুসলমানের গোপনীয়তা রক্ষা করে আল্লাহ্তাআলা কিয়ামতের দিন তার গোপনীয়তা রক্ষা করবেন। (রিয়াদুস্ সালেহীন))

তো দেখুন, এটা আল্লাহ্তাআলার দোষ ত্রুটি গোপন করা। যার কারণে গুণাহ্ মাফ করে দেয়া হয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ভাই এর সাহায্য সহযোগীতা করার জন্য চেষ্টা করতে থাকবে তো আল্লাহ্তাআলা তাকে সহযোগীতা করতে থাকবেন। সাদৃশ্য পূর্ণ অপর একটি রেওয়ায়েতে এসেছে কিন্তু এর মধ্যে একটি

সতর্কীকরণ রয়েছে। ভয়ও দেখান হয়েছে যারা গোপনীয়তা রক্ষা করে না তাদেরকে। হুযূর আকরাম (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাই এর দোষ ত্রুটি গোপন করেছে আল্লাহ্তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটিকে ঢেকে দিবেন এবং তার দোষকে গোপন করবেন। আর যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাই এর গোপনীয়তাকে প্রকাশ করবে আল্লাহ্তাআলা তার দোষত্রুটিকে এমনভাবে প্রকাশ করবেন যে, তাকে তার ঘরে তাকে অপমানিত ও অপদস্থ করবেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ)

সুতরাং দেখ, কত বড় ভয়ের বিষয়। দুর্বলতা তো সবার মধ্যে থেকে থাকে। তো আল্লাহ্তাআলা যখন নগ্নতা প্রকাশ করে অপদস্ত করতে থাকবেন তখন সে ব্যক্তির কোন রক্ষাকারী থাকবে না। কোন রক্ষার স্থানও থাকবে না। এ কারণে প্রত্যেকের অন্যের দোষ দেখার বদলে নিজের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

পুনরায় একটি রেওয়ায়েতে এসেছে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সঃ) বলছেন, যে বান্দা এই দুনিয়ায় অপর বান্দার দোষ ত্রুটি গোপন করবে আল্লাহ্তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন। (সহীহ্ মুসলিম কিতাবুল বিররে ওয়াসিলাহ্) অর্থাৎ গোপনীয়তা রক্ষাকারীকে আল্লাহ্ প্রতিদান না দিয়ে ছাড়বেন না এবং কিয়ামতের দিন তার প্রতিদান দিবেন।

মন্দের প্রকাশ দ্বারা মন্দের প্রসার এবং পুরো সমাজকে নিজ আয়ত্বে নিয়ে নিতে পারে। এর সম্ভাবনা থাকে যে ভাবে আমি ইতিপূর্বে বলেছি। এ কারণে মন্দের প্রকাশ করা উচিত নয়। এর দ্বারা মন্দ ছড়াতে থাকে এবং এটা অভিজ্ঞতার কথা একজনকে দেখে অন্যজন এভাবে অনেক মন্দ ছড়িয়ে থাকে। আর এ ব্যাপারে রসূলে করীম (সঃ) আমাদেরকে বড় তাকিদ করেছেন।

তিনি (সঃ) বলেছেন, যে "যদি তুমি লোকদের দুর্বলতার পিছে লেগে থাক তবে তুমি তাকে নষ্ট করবে। অথবা তার মধ্যে নষ্ট হওয়ার অবস্থা তৈরী করে দিবে। (সুনানে আবু দাউদ)

দুর্বলতার পিছনে লেগে থেকে, পুনরায় বড় করে লোকদের মাঝে প্রকাশ করা, ছড়ানোর উদ্দেশ্যে থাকে। কোন মন্দ যখন তা ছড়ানো হয় তখন তার কলহ/দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এখানে লোকদের যারা গোপনে অন্যের দোষ ত্রুটি অন্বেষণ করে অথবা তার দোষ ত্রুটি এবং দুর্বলতাকে ছড়িয়ে থাকে, বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা এটা মনে করো না যে, তোমরা হয় তো এর দ্বারা কোন সংশোধনের কাজ করেছ বরং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছ। দুনিয়াতে বিভিন্ন ধরনের মনমানসিকতার লোক হয়ে থাকে। অনেক সময় নিজের বিরুদ্ধে কথা শুনে এমন ধরনের লোক যাদের মন্দের অপকর্মের প্রকাশ হয়ে যায় তখন আরও বেশি করে সে মন্দ কর্ম করা শুরু করে দেয় যে, এ কথাতো সকলেই জেনে গেছে। যা একটা পর্দা ছিল তা-ও তো শেষ হয়ে গেছে। তো এর দ্বারা সংশোধন অবস্থা একেবারেই শেষ হওয়ার অবস্থায় পরিণত হয়। যদি কারো কোন ত্রুটি এবং দুর্বলতা থাকে সেখানে কর্মকর্তাদের উচিত তা সংশোধনের চেষ্টা করা।

মিডিয়াগুলো যারা নির্লজ্জতা ছড়াচ্ছে যদি তারা লজ্জা শরম এবং গোপনীয়তা রক্ষা করে তবে অর্ধেকের বেশি মন্দ শেষ হয়ে যাবে, সমাজের অপরাধ এবং পাপ শেষ হয়ে যাবে। কারণ সংবাদপত্রসমূহ ও TV লজ্জা শরমের অনুভূতি নষ্ট করে দিয়েছে।

একটি মন্দের প্রকাশের ফলে তার গুরুত্ব বা মূল্য থাকে না। আর যদি ধীরে ধীরে সেই মন্দ প্রকাশ হওয়া শুরু হয়ে যায় তো পুনরায় সমাজে সেই মন্দের গুরুত্ব থাকে না আর এটা অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত। যেভাবে আমি বলেছি, যদি পর্দা শেষ হয়ে যায় তাহলে মন্দের অনুভূতিই বাকী থাকবে না। উদাহরণ স্বরূপ এটাই দেখে নিন, আজকাল সিনেমা, নাটক ইত্যাদি টেলিভিশনে দেখানো হয়ে থাকে। আর যখন থেকে এমন নাটক আসা শুরু হয়েছে যার মধ্যে হত্যা ও লুণ্ঠন ধ্বংস অপহরণ মাদকদ্রব্য ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়েছে তখন থেকে সমাজে এগুলো বেশি ছড়িয়েছে; টিভি চ্যানেলসমূহ, মিডিয়াগুলো ওগুলোকে ছড়াতে বড় সাহায্য করেছে। নিজেদের তরফ থেকে সংশোধনমূলক নাটক বানাচ্ছে তাতে শেষ পরিণাম দেখানো হচ্ছে অপরাধীরা ধরা পড়েছে কিন্তু খবরই নাই যে, অবশেষে সংশোধনের কথা কারো চিন্তায় এসেছে কিনা। কিন্তু মন্দ অবশ্যই ছড়িয়ে পড়েছে। বাচ্চাদের চিন্তা ধারা TV নাটক দেখেই নষ্ট হয়ে থাকে। আর যখন বড় হয়ে যৌবনে প্রবেশ করে তখন গরীব দেশসমূহে প্রয়োজনের খাতিরে এবং ধনী দেশে বিনোদনের উদ্দেশ্যে ঐ কুকর্মসমূহ করা শুরু হয়ে যায়। সুতরাং দেখবেন যে, পশ্চিমা দেশসমূহে স্বাধীনতার নামে অনেক নির্লজ্জতা এবং মন্দ কর্ম সৃষ্টি হয়েছে।

হুযূর (সঃ) যখন এটা বলেছেন যে, এই মন্দসমূহের প্রকাশ থেকে তোমরা আরও মন্দের সৃষ্টি করতে তো আজকাল যদি পরীক্ষা নেওয়া হয়, যেভাবে আমি বলেছি, দেখা যাবে যে, এই মন্দসমূহের প্রকাশের কারণেই এ মন্দসমুহ সৃষ্টি হচ্ছে। আল্লাহ্তাআলা আমাদের সন্তানদেরকেও এ মন্দসমূহ থেকে হেফাযতে রাখুন।

আর একটি রেওয়ায়েতে এসেছে যে, রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ্তাআলা লজ্জা ও গোপনীয়তাকে পছন্দ করেন।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল ৪র্থ খন্ড ; ২২৪ পৃঃ)।

যদি দেখ এটাও প্রথম হাদীসের সাথে মিলে গেছে। মিডিয়াগুলো যারা নির্লজ্জতা ছড়াচ্ছে যদি তারা লজ্জা শরম এবং গোপনীয়তা রক্ষা করে তবে অর্ধেকের বেশি মন্দ শেষ হয়ে যাবে, সমাজের অপরাধ এবং পাপ শেষ হয়ে যাবে। কারণ সংবাদপত্রসমূহ ও TV লজ্জা শরমের অনুভূতি নষ্ট করে দিয়েছে। পার্কসমূহেও লজ্জা শরম ভুলে প্রকাশ্যে নগ্নতা প্রকাশ পাচ্ছে। লজ্জা শরম না থাকাতে এমন হচ্ছে। আজ পশ্চিমা জগতে লজ্জা ও আবরনের মাপকাঠি বদলে গেছে। সুতরাং এদিক ওদিক না দেখে অন্যের ত্রুটি অন্বেষণ না করে আমাদেরকে নিজের জন্য এবং আমাদের সন্তানদের জন্য দোয়া করা দরকার, আল্লাহ্তাআলা এসব কিছু থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

অপর একটি হাদীসে এসেছে, রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন "আল্লাহ্তাআলার কিতাবে বড় মর্যাদাপূর্ণ একটি আয়াত এই যে, তিনি (সঃ) "মা আসাবাকুম"-আয়াত পড়ে বললেন ; যে সমস্ত আপদ বিপদে তোমরা পড় তা তোমাদের নিজেদের কর্মফল এবং আল্লাহ্ তো অনেক অপরাধ মাফ করে দেন।" "তোমরা যেসব

দুর্ভোগ পোহাও"-এর তফসীর বর্ণনা করেছেন যে, এখানে যে শাস্তি এবং দুর্ভোগ পোহাতে হয় মানুষকে এসব তাদের নিজের ভুলের কারণেই এসে থাকে এবং আল্লাহ্ পরকালে এসব শাস্তি আবার দিবেন কারণ তিনি কৃপাকারী ও দয়ালু। আর যে সকল অপরাধ দুনিয়াতে ক্ষমা করেছেন আর কোন পাকড়াও হয়নি তার জন্যও পরকালে কোন শাস্তি হবে না। কারণ তিনি নম্র (হালীম)। ক্ষমার পরে আবার পাকড়াও করবেন না। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)

এ সমস্ত হাদীস দ্বারা আল্লাহ্তাআলার বান্দার সাথে ক্ষমা এবং মাগফেরাতের সম্পর্কের প্রকাশ হয়। তাই বান্দারও অধিকার নাই যে, আল্লাতাআলার বান্দাদের গোপনীয়তা রক্ষা না করবে। বরং অপরের জন্যও দোয়া করা উচিৎ এবং নিজের জন্যও দোয়া করা উচিৎ, আল্লাহ্তাআলা যেন সর্বদা আমাদের গোপনীয়তা রক্ষা করেন।

আঁ হযরত (সঃ) আমাদেরকে এজন্যও দোয়া শিখিয়েছেন। দোয়া এই যে, "হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছ থেকে দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা চাই। হে আমার মালিক! আমি তোমার থেকে দ্বীন-দুনিয়া ধন দৌলত এবং গৃহ সংসারে শান্তি চাই। হে আল্লাহ্! আমার দুর্বলতা ঢেকে দাও আর আমাকে আমার ভয় ভীতিসমূহ থেকে নিরাপদ কর। হে আল্লাহ্! সামনে পিছনে, ডানে-বামে, আর উপর থেকে তুমি নিজে আমাকে নিরাপত্তা দান কর। আমি তোমার শ্রেষ্ঠত্বের আশ্রয় চাইছি যে, আমি নিচে থেকে কোন গোপন বিপদের শিকার না হই। (আবু দাউদ কিতাবুল আদব)

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর এ বিষয়ে কি উদাহরণ ছিল এবং তাঁর হৃদয়ের কি অবস্থা ছিল তা আমি পেশ করছি। তিনি (আঃ) বলেছেন ঃ "হত্যার মকদ্দমায় আমাদের এক বিরোধী সাক্ষীর সম্মান আদালতে কম করার উদ্দেশ্যে তার শক্তিকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে আমাদের উকিল চাইল যে তার মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু আমি আমার উকিলকে বাধা দিলাম এবং বল্লাম, এমন প্রশ্ন করো না যার উত্তর সে সম্পূর্ণ না দিতে পারে এবং এমন কলঙ্ক লাগিও না যা সে ধুতে না পারে। অথচ ওরা তো আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ লাগিয়েছে। মিথ্যা মামলা চাপিয়েছে। মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। হত্যা ও কয়েদ করতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। তারা আমার ইজ্জতের উপর কী কী আক্রমণ না করছে। এখন বলো আমার উপর কোন ভীতি ভর করেছিল যে, আমি আমার উকিলকে এমন প্রশ্ন করা থেকে থামিয়ে দিয়েছিলাম। শুধু বিষয় এই ছিল যে, আমি এ কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, কারো ওপর এমন যেন না হয় যে সত্যিকার অর্থে তার হৃদয় ব্যথিত হয় এবং পলায়নের কোন পথ না থাকে।" যখন তিনি (আঃ) এটা বলেছেন তখন সেখানে বসা কোন ব্যক্তি এই আরজ করল যে, আমার হৃদয়তো এখনও ভীত হচ্ছে। অর্থাৎ আমার ভাল লাগলো না যে, এ প্রশ্ন কেন করা হোল না? এ প্রশ্ন তাকে নীচু করার জন্য হওয়া দরকার ছিল। তিনি (আঃ) বল্লেন "আমার হৃদয় এমন সহ্য করে নি।" মনে হয় সে খুব বেশি রাগান্বিত ছিল, পুনঃরায় বলল, এ প্রশ্ন অবশ্যই হওয়া উচিত ছিল। তিনি (আঃ) বল্লেন "খোদা আপনার হৃদয়কে তো এমনই বানিয়েছেন, বল, আমার কী করার আছে!" (মলফূযাত ৩য় খন্ড ৫৯ পৃষ্ঠা) আর এমন তাঁর (আঃ) জামাতের প্রত্যেক সদস্যের হওয়া উচিত ছিল। আর এই শিক্ষায়ই তিনি (আঃ) আমাদেরকে দিয়েছেন যা ইসলামের সঠিক চিত্র।

আমাদের ধর্ম তো এটা যে, যদি আমাদের বন্ধুদের কেউ মদ পান করে এবং বাজারে পড়ে থাকে আমরা নির্ভয়ে, নিন্দুকদের নিন্দার ভ্রুক্ষেপ না করে তাকে উঠিয়ে নিয়ে আসবো।

পুনঃরায় তিনি (আঃ) বল্লেন, এটা আমার ধর্ম; যে ব্যক্তি বন্ধুত্বের অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় তার ঐ অঙ্গীকারের এতদূর এতদূর সুযোগ দেয়া উচিত যে, ঐ ব্যক্তি যেমনই হোক আরো কিছু যদি হয়ে যায় আমি তার সাথে সম্পর্ক ছেদ করতে পারি না। হ্যাঁ যদি সে নিজে সম্পর্ক ছিন্ন করে তখন আমরা নিরুপায়। কিন্তু আমাদের ধর্ম তো এটা যে, যদি আমাদের বন্ধুদের কেউ মদ পান করে এবং বাজারে পড়ে থাকে আমরা নির্ভয়ে, নিন্দুকদের নিন্দার ভ্রুক্ষেপ না করে তাকে উঠিয়ে নিয়ে আসবো। তিনি (আঃ) বলেন, বন্ধুত্বের অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া বড়ই দামী জহরত এটাকে সহজেই নষ্ট করে দেওয়া উচিত নয়। আর বন্ধুদের থেকে যে কোন প্রকার অসহনীয় কথা হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি ও ধৈর্য ধারণ করা উচিত। (গোপনীয়তা রাখা ও ধৈর্যধারন করা উচিত) (সিরাতে তাইয়েবা পৃঃ ৫৬)।

হযরত মৌলবী শের আলী সাহেব (রাঃ) এর সাথে আর একটু যুক্ত করেছেন এবং তার রেওয়ায়েতে লিখেছেন যে, তিনি (আঃ) পরে এটাও বলেছেন যে, "তাকে জ্ঞান ফিরাতে চেষ্টা করবো এবং যখন জ্ঞান ফিরতে শুরু করবে তখন তার পাশ থেকে উঠে চলে আসব যাতে সে আমাকে দেখে লজ্জিত না হয়।" তিনি জামাতকে এ নসিহত করেছেন যে, জামাতের প্রত্যেকে একটি পরিবারের মত তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাক এবং একে অপরের দোষকে গোপন কর। (সীরাতে তাইয়েবাহ্- ৫৬)

একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর মজলিসে কারো কোন দুর্বলতা একজন উল্লেখ করলো। তিনি (আঃ) শুনলেন এবং ঐ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বল্লেন তার ত্রুটি এবং দুর্বলতা তো শুনেছ তার গুণেরও উল্লেখ করা দরকার ছিল।" (লেকচার যিকরে হাবিব ; হযরত মুফতী মোহাম্মদ সাদেক (রাঃ) পৃঃ ৫৭)

গুণের উল্লেখের ফলে পুণ্যের প্রসার হয়। কেউ মালী কুরবানী করছে, কেউ অন্য কোন ধরনের কুরবানী করছে। ঐ কুরবানীসমূহের যখন উল্লেখ করা হয় তখন অন্যান্যদের মধ্যেও উৎসাহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু মন্দ বিষয়সমূহের যদি সমাজে উল্লেখ করা হয় তখন মন্দই প্রসারিত হয়, যে ভাবে আমি বলেছি। সেই নমুনা নষ্ট হয়ে যায়, লজ্জা শরম শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত এই যে, কারো মন্দ কথা বর্ণনা করে তার জন্য লজ্জা বা রাগের কারণ সৃষ্টি করা হয়। যদি ভাল দিকসমূহ বর্ণনা করা হয় তবে এর দ্বারা উপকার হয়। সমাজ নষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে যায়। অন্যের মন্দ বিষয় বর্ণনা করে মানুষ নিজেও পাপ করে। যদি শুধু ভাল ও পুণ্যের কথা বলা হয় তাহলে এর দ্বারাও সে নিজেকে নিরাপদ করে নেয়। এভাবে এক তো গোপনীয়তার এক নেকী আরো অনেক নেকীর জন্ম দেয়।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ আসলে মানুষের গোপনীয়তা আল্লাহ্তাআলা রক্ষা করেন। কেননা তিনি তো সাত্তার। আর অনেক লোক খোদাতাআলার সাত্তারীয়তের কারণে নেক হয়ে আছে। অথচ যদি আল্লাহ্তাআলা গোপন না করতেন তবে বোঝা যেত যে মানুষের মাঝে কতই না গোপন দোষ ত্রুটি আছে।"

আরও বলেছেন যে ঃ "মানুষের ঈমানের এটাও একটা বিরাট দিক যে, "তুমি নিজের চরিত্রকে আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত কর অর্থাৎ আল্লাহ্‌র গুণাবলী নিজের মধ্যে বাস্তবায়ন কর। যতদূর সম্ভব খোদাতাআলার রঙ্গে রঙ্গীন হওয়ার চেষ্টা কর। উদাহরণ স্বরূপ যেমন, খোদার মধ্যে ক্ষমার গুণ আছে, মানুষও ক্ষমা করবে ; রহম আছে, নম্রতা আছে, কৃপা আছে, মানুষও রহম করবে, নম্রতা দেখাবে, কৃপা করবে। খোদাতাআলা সাত্তার। মানুষ সত্তারীয়তের গুণ থেকে অংশ নিবে। আর নিজের ভাই এর দোষ ক্রটির গোপনীয়তা রক্ষা করা উচিত। দোষ, ক্রটি, গুণাহ্‌ ভুলসমূহের পর্দা রক্ষা করা দরকার। অনেক লোকের অভ্যাস আছে যে, যখন কারো মন্দ বিষয় অথবা ক্ষয় ক্ষতি দেখে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা ভালভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত না করে তার কখনও ভাত হজম হয় না। তিনি বলেন হাদীসে এসেছে যে ব্যক্তি তার ভাই এর ক্রটি লুকায় খোদাতাআলা তার গোপনীয়তা রক্ষা করে। মানুষের উচিত অনিষ্টকারী যেন না হয়। লজ্জাহীন না হয়। মানুষের সাথে মন্দ আচরণ যেন না করে, ভালবাসা ও নেকীর আচরণ করে।" (মলফূযাত ৫ম খন্ড; ৬০৮ পৃঃ)

হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ আসল কথা এই যে, এখন জামাতের প্রাথমিক অবস্থা। কতক দুর্বল যেভাবে কঠিন অসুখ থেকে উঠে আসে, কতকের মাঝে কিছু শক্তি এসেছে। সতুরাং যাকে দুর্বল দেখ তাকে গোপনে নসিহত কর। যদি না মানে তবে তার জন্য দোয়া কর। আর যদি উভয় ভাবেই ফায়দা না হয় তবে তার বিষয় ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দাও। যখন খোদাতাআলা এদের কবুল করেছেন তো তোমাদেরও উচিত যে, কারো ক্রটি দেখে মাথা গরম যেন না হয়। হতে পারে, ঠিক হয়ে যাবে। দরবেশের দ্বারাও অনেক সময় কোন ক্রটি হয়ে যায়। বরং লিখেছেন যে, দরবেশ দ্বারাও ব্যভিচার হয়ে থাকে। অনেক চোর ও ব্যভিচারি অবশেষে দরবেশ বনে গেছে। দ্রুততার সাথে কাউকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় বরং তার সংশোধনের জন্য পূর্ণ চেষ্টা করা উচিত। কুরআন করীমের আদৌ এটা শিক্ষা নয় যে, দোষ ক্রটি দেখ ও ছড়াও আর অন্যদের সাথে বলতে থাক। বরং কুরআন বলে, মুমেনরা পরস্পরকে উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে দয়া করার উপদেশ দেয়।" (সূরা বালাদ ঃ ১৮) সর্বোত্তম এটাই যে, অন্যের ক্রটি দেখে তাকে নসিহত করা হয় এবং তার জন্য দোয়াও করা হয়। দোয়ায় বড় ফল হয়ে থাকে। আর ঐ ব্যক্তির জন্য বড় আফসোসের বিষয় যে এক জনের ক্রটি বর্ণনা তো একশবার করেই থাকে। কিন্তু একবারও দোয়া করে না। কারো ক্রটি ঐ সময়ই বর্ণনা করা দরকার যখন কিনা তার জন্য ৪০ দিন দোয়া করা হয়। তা-ও কান্নাকাটি করে। শেখ সাদী একটা কথা লিখেছিলেন যে, খোদাতাআলা তো জেনে শুনে গোপন করে কিন্তু বন্ধুদের জানা থাকে না অথচ চিৎকার করতে থাকে। খোদাতাআলার নাম সাত্তার, তোমাদের উচিত তাখাল্লাকু বিআখলাকিল্লাহ্‌

যাকে দুর্বল দেখ তাকে গোপনে নসিহত কর। যদি না মানে তবে তার জন্য দোয়া কর। আর যদি উভয় ভাবেই ফায়দা না হয় তবে তার বিষয় ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দাও। যখন খোদাতাআলা এদের কবুল করেছেন তো তোমাদেরও উচিত যে, কারো ক্রটি দেখে মাথা গরম যেন না হয়। হতে পারে, ঠিক হয়ে যাবে।

কর। আমাদের এ উদ্দেশ্য নয় যে, দোষ ক্রটির বন্ধু হও, বরং এটা প্রচার কর না এবং গীবত কর না। কেননা যেভাবে আল্লাহ্‌র কিতাবে এসেছে, এটা গুণাহ্‌ যে কারও দোষ ছড়ানো এবং গীবত করা। তিনি (আঃ) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। শেখ সাদীর ২ জন ছাত্র ছিল। যার মধ্যে একজন ধর্মের শিক্ষা বর্ণনা করতে খুব উপযুক্ত ছিল। সে বেশি বুঝত। আর অপরজনের এতটা বুঝার ক্ষমতা ছিল না। সে রাগ করতো। অবশেষে প্রথম জন সাদীর কাছে বর্ণনা করল যে, যখন আমি কিছু বর্ণনা করি তখন অপরজন জ্বলতে থাকে আর হিংসা করে। শেখ সাদী উত্তর দিলেন 'একজন দোযখের রাস্তা নিয়েছে। যে হিংসা করেছে। সে হিংসা করে দোযখে চলে গেছে। আর তুমি গীবত করেছ। সে হিংসা করে দোযখে যাচ্ছে আর তুমি গীবত করে দোযখে যাচ্ছ।" সুতরাং আমাদের জামাতে চলতে পারে না যদি না দয়া, দোয়া ও সাত্তারীয়ত এবং পরস্পরকে এর উপদেশ দেয়ার অভ্যাস না করবে।" (মলফুযাত ৪র্থ খন্ড পৃঃ ৬০)।

হযরত (আঃ) আরো বলেছেন ঃ "আমাদের জামাতের উচিত, কোন ভাই এর দোষ ক্রটি দেখে তার জন্য দোয়া করা। কিন্তু যদি সে দোয়া না করে, আর তা বর্ণনা করতে থাকে তবে সে গুনাহ্‌ করে। কোন এমন দোষ ক্রটি আছে যা কিনা দূর হতে পারে না? এ কারণে সর্বদা দোয়ার মাধ্যমে অপর ভাই এর সাহায্য করা উচিত।" (মলফূযাত ৪র্থ খন্ড ; পৃঃ ৬০)

সুতরাং এমন অবস্থায় হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) তাঁর জামাতকে দেখতে চেয়েছেন। আর আমরা আমাদের মাঝে এই অবস্থা সৃষ্টি করবো ইনশাআল্লাহ্‌। যদিও জামাত বহু কুরবানীর ফলে খোদাতাআলার ফযলে অনেক এগিয়ে গেছে। বিশ্বস্ততা এবং আন্তরিকতায় অনেক বেশি এগিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ্‌ । কিন্তু কতক ছোট ছোট মন্দে জড়িত আছে যার মধ্য থেকে একটি এই যে, অপরের দুর্বলতা নিয়ে তার ব্যাখ্যা করা এবং অপরকে বলা। এ সকল বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া খুব দরকার। কেননা যখন নবীর যুগ থেকে মানুষ দূরে যেতে থাকে এবং সরাসরি নবীর কাছ থেকে তরবীয়ত পাওয়া ব্যক্তি ধীরে ধীরে কম হতে থাকে। এখন তো সকলেই চলে গেছেন ফলে এখন এই তরবিয়ত প্রাপ্ত লোক থেকে কল্যাণ পাওয়া ব্যক্তিও কম হওয়া শুরু হয়ে গেছে।

তারপর, জামাতে নতুন আগমনকারীদের সংখ্যাও আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে বড় দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছে। এখন দোয়া ও ইস্তেগফারের সাথে এ বিষয়গুলোকে সাধারণ মনে করা উচিত নয় বরং ধর্মের সব হুকুমকে যদিও তা ছোট হোক বা বড় হোক হুকুম মনে করে নিজের জীবনের অংশ বানানো উচিত এবং নিজের করে নেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে তৌফীক দান করুন। আমীন।

(আলফযল লন্ডন; ৩ ডিসেম্বর ২০০৪ ইং)

অনুবাদক ঃ মাওলানা শেখ মুস্তাফিজুর রহমান ও মাওলানা মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম

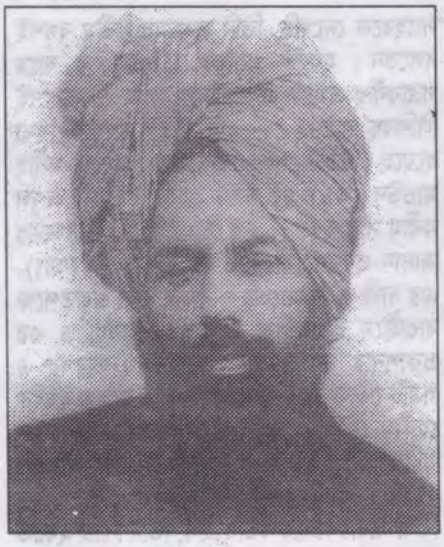

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চিঠি-পত্র

(মকতুবাতে আহ্মদীয়া, ৫ম খন্ড)

সংকলক– হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী (রাঃ)

(পঞ্চম কিস্তি)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) এর নামে

পত্র নং ২০

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজ আপনার পত্র পেয়েছি। এতে লিখা সব বিষয় অবহিত হলাম। প্রেস এবং অন্যান্য খরচাদির ব্যাপারে আমি চিন্তিত ছিলাম। আপনার এই সুসংবাদবহ পত্রটির দরুন সব দুশ্চিন্তা দূর হলো। 'জাযাকুমুল্লাহু খাইরাল জাযা ওয়া আহসানা ইলাইকুম ফিদদুনিয়া ওয়ালউকবা ওয়া আযহাবা আনাকুমুল হুযনা ওয়া রাযেয়া আনকুম ওয়া রাযা, আমীন' (–আল্লাহ্‌তাআলা আপনাকে উত্তম প্রতিদানের দ্বারা ভূষিত করুন এবং ইহকালে ও পরকালে আপনার প্রতি কল্যাণ বর্ষিত করুন এবং আপনার সব দুঃখ-বেদনা দূর করুন এবং আপনার প্রতি সর্বতঃসন্তুষ্ট হোন'–অনুবাদক)।

১৮৮৭ সালের এপ্রিলের শেষ দিকে দেখা স্বপ্নঃ

কয়েকদিন হলো আমি প্রয়োজনীয় সে ঋণের চিন্তা ভাবনার অবস্থায় স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, আমি একটি নীচু গর্তে দাঁড়িয়ে আছি এবং উপরে উঠে আসতে চাই, কিন্তু হাত (সেখান পর্যন্ত) লাগাল পায় না। এমতাবস্থায় একজন খোদার বান্দা আসলেন। তিনি উপর থেকে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, আর আমি তার হাত ধরে উপরে ওঠে আসলাম এবং ওঠে আসা মাত্র বললাম, 'খোদা তোমাকে এ খিদমতের প্রতিদান প্রদান করুন।'

আজ আপনার চিঠি পড়া মাত্র আমার হৃদয়পটে পাকাপোক্তভাবে এ বিষয়টি প্রোথিত ও অঙ্কিত হয়েছে যে, যার হাত ধরায় দুর্ভাবনা নিরসন হলো সে ব্যক্তি আপনিই। কেননা আমি যেমন স্বপ্নে হাত ধারণকারী ব্যক্তির জন্য দোয়া করি, তেমনি বিগলিত চিত্তে পত্রপাঠে মুখ দিয়ে আপনার জন্য হৃদয় নিংড়ানো দোয়া নিঃসৃত হলো।

'ফামুস্তাজাবুন ইনশাআল্লাহুতাআলা"(–অতএব আল্লাহ্ চাইলে এ দোয়া কবুল হয়েছে-অনুবাদক)।

আমার চিঠি পৌঁছার পর আপনি যদি মাসে মাসে তিনশ' টাকার মত পাঠাতে পারেন যাতে করে অবশেষে চৌদ্দশ' টাকা পুরা হয়ে যায় তাহলে এটা অতি উত্তম কথা, কিন্তু প্রথম বারে পাঁচশ' টাকা পাঠানো জরুরী। যাতে (ছাপাখানা স্থাপনের) আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করা যায়। আমার ইচ্ছা এ কাজটি যেন রমযান মাসে চালু হয়ে যায়। মুন্‌শী রুস্তম আলী নামের একজন ব্যক্তি তিনশ' টাকা দেড় বছরের মেয়াদে ঋণ দিতে চেয়েছেন এবং বাবু ইলাহী বখ্‌শ সাহেবও কিছু দিতে চান। অতএব যেই পরিমাণ টাকা অন্যান্যদের পক্ষ থেকে ঋণস্বরূপ আসবে সেই পরিমাণ টাকা আপনাকে কম দিতে হবে। কিন্তু এ ঋণের প্রকৃত নির্ভরতা আপনার নামেই থাকলো। আমি আপনার চিঠি বাবু ইলাহী বখ্‌শ সাহেবের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছি কেননা আমি চাই, আপনার হৃদয়ের প্রশস্ততা, উচ্চ সাহসিকতা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সম্পর্কে আমার অন্যান্য বন্ধুরা যেন অবগত হন।

সুপারিশঃ গতকাল বাবু ইলাহী বখ্‌শ সাহেবের একটি পত্র এক ব্যক্তির সুপারিশ সম্পর্কে এসেছে। অতএব সে পত্রটি আপনার খিদমতে পাঠানো হল। আপনি সুযোগ-সুবিধা মতো যেভাবে সমীচীন হয় নিজ সহানুভূতিকে কাজে লাগাবেন। আপনার ইঙ্গিতে যদি কোন মুসলমানের উপকার ও অবস্থান্নোয়ন বিবেচিত হয় এবং স্বয়ং সে ইঙ্গিত (-সুপারিশ) নিছক কল্যাণজনক ও ফেৎনামুক্ত হয়, তাহলে এটা নিঃসন্দেহে সওয়াবের কারণ। কেননা "খাইরুন্নাসে মান ইয়ান্‌ফাউন নাসা" (-মানুষের মাঝে সে ব্যক্তি সবচে' উত্তম, যে মানুষের উপকার করে-অনুবাদক)। আপনার অধিকতর কুশল কামনা করি।

ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
কাদিয়ান, ২মে ১৮৮৭ইং

চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শঃ

পুনঃ আমার মেয়ে (শিশুকন্যা) দু'মাস যাবৎ জ্বর, দাস্ত, স্ফীতি প্রদাহ ও তীব্র পিপাসা ইত্যাদি উপসর্গে ভুগছে। প্রায় তিনশ' বার দাস্ত হয়েছে। তিন বার জোলাপ (বিরেচক ওষুধ) খাওয়ানো হয়েছে এবং জোঁকও ধরানো হয়েছে। যেহেতু তীব্র জ্বর ছিল, জিহ্বা কালো হয়ে গিয়েছিল সেজন্য ছয় সাত বার লেবুর শরবত ও ক্ষিরার শিরার সাথে কর্পুরও দেয়া হয় এবং বনস্পতি ও পদ্মফুলের শরবত ও অন্যান্য শীতল পদার্থ অনেক দেয়া হয়। এখন জ্বরের তীব্রতা তো নেই এবং প্রদাহও হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু তবু অল্প অল্প জ্বর ও পিপাসা রয়ে গেছে। শরীর জীর্ন শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, শরবতে দিনারের সাথে ইসবগোলের ভুষির শরবত দেব। কিন্তু এখানে উত্তম মানের ইসবগোলের ভুষি পাওয়া যায় না। খাঁটি রেওন্দের (চারা বিশেষ) চিনিও পাওয়া যায় না। মেয়েটির বয়স এক বছর দু' মাস। এ বয়সে এত মারাত্মক জ্বর হয়েছে যে তাকে দশ বোতল বেদমুশ্‌ক (এক প্রকার সুগন্ধি বৃক্ষের ফুলের রস)-এর শরবত, প্রায় এক বোতল লেবুর রস, ইসবগোলের শরবত, ক্ষিরার শিরা এবং ছয় সাত বার কর্পুর দেয়া হয়েছে। দু'বোতল বনস্পতি ও পদ্ম ফুলের শরবতও পান করানো হয়েছে। এখন প্রদাহের উপশম হয়েছে। মনে হয়, এটা সাময়িক ছিল। কিন্তু জ্বরের লক্ষণাবলী এখনও প্রবল। তাজা ইসবগোল এক তোলা এবং রেওন্দের চিনি পাওয়া গেলে অবশ্যই পাঠাবেন।

ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
কাদিয়ান, ২মে ১৮৮৭ইং

পত্র নং ২১

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

অপেক্ষায় থাকার মুহূর্তেই আপনার পত্র পেলাম। আল্লাহ্‌তাআলা আপনাকে হাসি-খুশি ও উৎফুল্ল রাখুন। আমি প্রভু প্রতিপালক জাল্লাশানুহুর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারছি না, যিনি এমন আন্তরিক নিষ্ঠাবান ও পুরো মাত্রায় ভালবাসার অধিকারী বন্ধুদের আমাকে বেছে বেছে দিয়েছেন। 'ফাল্‌হামদু লিল্লাহি আলা ইহ্‌সানিহি' (–'অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তাআলারই তাঁর এই অনুগ্রহের জন্য'-অনুবাদক)। পাঁচ কপি 'শোহ্‌না হক্ব'পুস্তক আপনার খিদমতে পাঠানো হয়েছে। কত বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই ইচ্ছা, যাতে নিজেদের প্রেস স্থাপন করে 'সিরাজে মুনীর' ইত্যাদি পুস্তক এতে মুদ্রণ করাই। অতএব খোদাতাআলা এ কাজের জন্য পুঁজির ব্যবস্থা করে দিলে শীঘ্রই প্রেস ইত্যাদির আবশ্যকীয় সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করে বই-পুস্তক ছাপানো শুরু করা যাবে। এ দিকে এখন তীব্র গরম পড়েছে। আশা করি, কাশ্মীরে মনোরম বসন্ত কাল শোভা পাচ্ছে। কাশ্মীরের তোহ্‌ফা (উপহার) হলো কাশ্মীরের কোন কোন ফল যেমন আপেলের মানুষ অনেক প্রশংসা করে থাকে। কিন্তু সে সব ফল তাজা রেখে মজুদ করা যায় না। আশা করি, শীঘ্র শীঘ্র কুশলাদি সম্বন্ধে অবহিত করতে থাকবেন। আল্লাহ্‌তআলা আপনাকে খুশি ও সুখে-শান্তিতে রাখুন এবং খুশি ও সুখে শান্তিতে আনয়ন করুন এবং আপনার সাথে থাকুন, আমীন।

ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ (উফিয়া আনহু)
কাদিয়ান, ১১ মে, ১৮৮৭ইং

পত্র নং ২২

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মিয়াঁ করীম বখ্‌শ সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার ভালবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ পত্রখানা পেলাম। কত আন্তরিকতা ও ভালবাসা দিয়ে আপনি যে চিঠি লিখেছেন সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। অতি কৃপাকারী (করীম) খোদা আপনাকে এর প্রতিদান প্রদান করুন।

হযরত মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেবের চারিত্রিক সদগুণাবলীর উল্লেখ ঃ

নিঃসন্দেহে প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব অতি প্রশংসনীয় চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী। তাঁর প্রতিটি পত্র দেখে আমি জানতে পারি যে, তিনি আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে সেসব দুর্লভ ব্যক্তিত্বদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা জগতে অতি বিরল। দৃঢ় মনোবল, উচ্চ সাহসিকতা, দৃঢ়চিত্ততা, অকপটতা, সরলতা, আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা ও সত্যপ্রিয়তার উঁচুমানের গুণাবলীর পাশাপাশি তাঁর মাঝে এমন নম্রতা, উদারতা, বিনয় ও অমায়িকতা পরিলক্ষিত হয় যে এসব ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মু'মিনের ঈর্ষা করা উচিত। "যালিকা ফায্‌লুল্লাহি ইউতিহী মাইঁইয়াশাউ" [–এটা আল্লাহ্‌র সেই ফযল (বিশেষ অনুগ্রহ), যা তিনি যাকে চান দিয়ে থাকেন–অনুবাদক]।। গুঢ়তত্ত্ব ঃ আমি ভালভাবে জানি এবং এ বিষয়ে আমার পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, কোন ব্যক্তি নিজ স্বচ্ছতা ও পবিত্রতায় আল্লাহ্‌তাআলাকে অতিক্রম করতে পারে না, আর তিনি তাঁর সৎ পুণ্যবান বান্দাদের প্রতিদান কখনও বিনষ্ট করেন না। তবে এটা সত্য যে, আন্তর্বর্তীকালে পরীক্ষা হিসাবে কল্যাণ প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। কিন্তু অবশেষে ঐশী কৃপা তাদের সহায়ক হয় এবং অশ্রুসজল চোখে মু'মিনদের এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, ঐশীকৃপা ও হিত সাধন, ঐশী সদাচরণ ও বদান্যতা তাদের পুণ্যের চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় ও উচ্চতর বটে।

হযরত মৌলবী সাহেবের সপক্ষে সুসংবাদ ঃ

কাজেই আমি আত্মসন্তুষ্টি ও নিশ্চয়তার সাথে মৌলবী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেবকে সুসংবাদ দিচ্ছি তিনি যেন (তাঁর জীবনের) সব বিষয়েই ঐশী কৃপা লাভের দৃঢ় আশা রাখেন। খোদাতাআলা তাকে বিনষ্ট হতে দেবেন না। সেই খোদা যাঁর হাতে রয়েছে সমস্ত কুদরত, যিনি অতি ক্ষমাশীল ও বার বার কৃপাকারী, তাঁর বিশ্বস্ত বান্দারা অবশেষে তাঁর কাছ থেকে নিজেদের কাঙ্ক্ষিত বিষয়াবলী লাভ করে থাকেন। আদিকাল থেকে তাঁর নিষ্ঠাবান বান্দাদের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়ম এটাই যে, মধ্যবর্তী কালে কিছু কিছু কষ্ট, ভয় ও মর্মবেদনা স্বীকার করে নিয়ে অবশেষে তাঁরা সফলকাম হয়ে থাকেন।

ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
কাদিয়ান, ১৪মে ১৮৮৭ইং

সংকলকের মন্তব্য ঃ

এ পত্রটি হচ্ছে হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব (রাঃ)-এর নামে। সেই সময়ে তিনি করীম বখ্‌শ নামেই পরিচিত ছিলেন। কেননা হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেবের নাম তাঁর পিতামাতা করীম বখ্‌শই রেখেছিলেন। আমি তাঁর সম্মানিত পিতা চৌধুরী মোহাম্মদ সুলতান সাহেবকে দেখেছি, তিনি সবসময় করীম বখ্‌শই বলতেন। হযরত খলীফা আওওয়ালের নামে পত্রাবলীর প্রসঙ্গে এ পত্রটিকে আমি এ কারণেই লিপিবদ্ধ করেছি যে, এটি তাঁরই সম্পর্কে লিখা হয়েছে। পত্রটি থেকে জানা যায় , হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে হযরত মৌলবী অব্দুল করীম সাহেব (রাঃ)-এর যোগাযোগ ও চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের ধারাটিও হযরত আকদস (আঃ)-এর দাবী ও বয়আতের পূর্বেকার এবং প্রকৃতপক্ষে বারাহীনে আহমদীয়া সম্পর্কিত ঘোষণা ও এর প্রকাশনার পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর এ পত্রটি থেকে এ-ও বুঝা যায় যে, ঐ সময়ে হযরত হেকীম মৌলবী নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর ওপর কোন পরীক্ষা ও সংকট জনক অবস্থা বিরাজ করছিল। হযরত হেকীম মৌলবী নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর যেমন কিনা সাধারণভাবে স্বভাব ছিল, তিনি নিজে হযরত আকদাস (আঃ)-কে এ সম্পর্কে কিছুই লিখেন নি, বরং হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব নিজে হযরত হেকীম মৌলবী নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও ভালবাসার কারণে সরাসরি হযরত আকদস (আঃ)-কে (ঘটনা) অবহিত করেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আকদস (আঃ) এই সান্ত্বনা ও সন্তিদায়ক চিঠি মাওলানা আব্দুল করীম সাহেবকে লিখেন এবং তিনি তা হযরত হেকীম মৌলবী নূরুদ্দীন (রাঃ)-কে দেখান। সে চিঠি হযরত খলীফা আওওয়াল নূরুদ্দীন (রাঃ) নিজের চিঠি-পত্রের (রেকর্ডের) অন্তর্ভুক্ত করে নেন। (ইরফানী)

পত্র নং ২৩

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্রখানা পেয়ে আনন্দিত ও কৃতার্থ হলাম। পাদ্রী সাহেবের কুট সমালোচনার জবাবে আপনি যা কিছু লিখেছেন তা খুবই উত্তম এবং যথার্থ। "জাযাকুমুল্লাহু খাইরান, জাযাকুমুল্লাহু খাইরা" (আল্লাহ্‌ আপনাকে উত্তমভাবে পুরস্কৃত করুন, আল্লাহ্‌ আপনাকে উত্তমভাবে পুরস্কৃত করুন–অনুবাদক)। ইসলাম ধর্ম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক প্রজ্ঞাপূর্ণ ধর্ম, যা হিকমত ও প্রজ্ঞার নিয়ম-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধর্মে এ কথা নেই যে, সর্বদা একগালে চপেটাঘাত খেয়ে অপরটিও পেতে দিবে বরং যা (করা) সময়োপযোগী তা করার তাগিদ রয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন ঃ "জাদিলহুম বিল হিকমাতি" (সর্বোত্তম পন্থায় অর্থাৎ হিকমতের

সাথে তুমি তাদের সঙ্গে বিতর্ক কর'-অনুবাদক)। "জাদিলহুম বিল হিল্ মি" (অর্থাৎ কেবল সহিষ্ণুতার সাথে বিতর্ক কর) এ কথা বলেন নি। ইনশাআল্লাহুল আযিয' ঠাকুরদাসের জন্য সে পরিমাণই দোয়া করবো। ছাপাখানার মূল্য ও খরচাদির জন্য আরও কয়েকজন বন্ধুকে লিখেছি। তাদের উত্তর আসলে (আপনাকে) অবহিত করবো।

ওয়াস্সালাম

বিনীত

গোলাম আহমদ, কাদিয়ান

মন্তব্যঃ এ পত্রটিতেও তারিখ নেই। কিন্তু এতে ১লা জুন তারিখের ডাক বিভাগের শীল-মোহর রয়েছে এবং কাদিয়ানের সিল-মোহরটি ৩১ মে ১৮৮৭ তারিখের। এটি একটি পোস্টকার্ড। (ইরফানী)

পত্র নং ২৪

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন (সাল্লামাহুতাআলা)

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজ আপনার পত্র পেয়ে আনন্দিত ও আশ্বস্ত হয়েছি। 'জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।' মৌলবী করীম বখ্শ সাহেবের চিঠির খামে তাঁর দ্বিতীয়বার লেখার পরিপ্রেক্ষিতে এ অধম পুস্তকগুলো পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেগুলো রেজিষ্ট্রী করা হয় নি। যদি এখনও পৌঁছে না থাকে তাহলে পুনরায় পাঠিয়ে দেয়া হবে। ছাপাখানা স্থাপন বিষয়ে আমি অনেক চিন্তা-ভাবনার পর কয়েকজন বন্ধুর নিকট থেকে ঋণস্বরূপ কিছু টাকা নেয়া সমীচীন বলে স্থির করেছি। সে টাকার কিছু অংশ প্রেস এবং পাথরের দাম বাবদ ব্যয় হবে এবং কিছু পরিমাণ (টাকায়)কাগজ কেনা হবে। এতোদ্দেশ্যে এরূপ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিদের নির্বাচন করতে গিয়ে যখন খরিদদারদের তালিকায় দৃষ্টি দেয়া হলো তখন সহস্র লোকের মাঝে কেবল ছয়জন ব্যক্তির ওপর নজর পড়লো, যাদের কয়েকজন দৃঢ়চরিত্রের অধিকারী আর কয়েকজনের প্রকৃত অবস্থা যথাযথ জানা নেই। অগত্যা দরদে দেলের সাথে (সকরুণ হৃদয়ে) এ দোয়া করতে হলো ঃ

ধর্মের সাহায্যকারী চেয়ে বিশেষ দোয়াঃ "রাব্বি আ'তিনি মিল্লাদুনকা আনসারান ফি দীনিকা ওয়া আযহিব আন্নি হুযনি ওয়া আসলিহ্ লি শা'নি কুল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আন্তা" (-'হে আমার প্রভু প্রতিপালক! তোমার নিকট থেকে আমাকে তোমার ধর্মের ক্ষেত্রে সাহায্যকারী দান কর এবং আমার দুঃখ-বেদনা দূর কর এবং আমার অবস্থা সম্পূর্ণ সুধরিয়ে দাও, তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই' -অনুবাদক)

আশা করি দোয়া কবুল হয়েছে। এখন আমি আপনার খিদমতে সবিস্তারে প্রকাশ করছি, চৌদ্দজন ব্যক্তিকে বেছে নিয়ে তাদের থেকে একশ' করে টাকা ঋণস্বরূপ নেয়া হবে যা 'সিরাজে মুনীর' পুস্তক প্রকাশের পর এক বছর মেয়াদে পরিশোধের ওয়াদা থাকবে অর্থাৎ পুস্তক ছেপে যাওয়ার পর মেয়াদের তারিখ শুরু হবে। যদিও 'সিরাজে মুনীর' ছাপার জন্য আনুমানিক চৌদ্দশ' টাকা ধরা হয়েছে এবং উল্লেখিত এ ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে কোনো সঙ্গতিসম্পন্ন বন্ধুর জন্যই বোঝাস্বরূপ হবে না। কিন্তু আফসোস,খরিদদারদের তালিকায় দৃষ্টি দেয়া হলে সেখানে কেবল ছয়জন ব্যক্তিকে এমন মনে হয়েছে যারা এ কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনোযোগী হতে পারেন। আমার ইচ্ছা এ কাজ অবশ্যই রমযান মাসে শুরু হয়ে যাক। আর আমি উক্ত অঙ্কের টাকা কেবল ঋণস্বরূপ গ্রহণ করতে চাই যাতে বন্ধুদের ওপর অল্প অল্প বোঝা হয় যা একশ' টাকার বেশি না হয়।

অতএব আপনার দৃষ্টিতে যদি এমন কিছু সংখ্যক নিষ্ঠাবান ব্যক্তি থেকে থাকেন যারা উল্লেখিত এ ঋণদানের কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারেন তাহলে ব্যাপারটি বেশ সহজ হতো। অন্যথায়, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর ভান্ডারসমূহের মালিক (আল্লাহ্)ই যথেষ্ট। উত্তর শীঘ্র জানাবেন, কেননা আমি ওয়াদা বদ্ধ আছি যে, 'কুরআনী শক্তির জ্যোতির্বিকাশ' পুস্তকটি জুন মাসে প্রকাশিত হবে। কাজেই আমি চাই, নিজেদেরই ছাপাখানায় এ পুস্তকটি ছাপার কাজ শুরু হয়ে যাক। এই ঋণের বিষয়ে আমার কোন অস্থিরতা নেই। আমি আমার অন্তঃকরণে অতি আনন্দ, স্বস্থি ও সুখ অনুভব করি এবং জানি, আমার দোয়াসমূহ তা করার পূর্বেই কবুল হয়ে আছে।

এ অধম সে হিন্দু ছেলেটির জন্য 'ইনশাআল্লাহুলকুদীর' দোয়া করবে।

ওয়াস্সালাম

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, জেলা গুরুদাসপুর

সংকলকের মন্তব্য ঃ এ চিঠির ওপরও কোন তারিখের উল্লেখ নেই। কিন্তু চিঠিগুলোর ধারাবাহিকতা দৃষ্টে জানা যায়, এটিও ১৮৮৭ সালের চিঠি। যেমন ২রা মে ১৮৮৭ ইং তারিখের পত্রটিও একই ধারাবাহিকতায় রয়েছে। (ইরফানী)

পত্র নং ২৫

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজ পাঁচশ' টাকা নোটের ১ম কিস্তি পৌঁছে গেছে। যেহেতু বর্ষাকাল চলছে, অনুগ্রহ করে যদি (টাকার) অপর কিস্তি রেজিস্ট্রীকৃত চিঠির মাধ্যমে পাঠান তাহলে ইনশাআল্লাহ্ কিছুটা সাবধানে পৌঁছে যাবে। ১৮ শাওয়াল আজকের তারিখে এখানে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। এখনও হচ্ছে। গতকাল এমন অবস্থা ছিল যে তীব্র গরম এবং বর্ষার একাংশ অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার দরুন মানুষ যেন নিরাশই হয়ে পড়েছিল।

গুঢ়তত্ত্ব ঃ 'সুবহানাল্লাহ্' সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কী 'শান' যে নিরাশার পর আশার সৃষ্টি করে দেন। এ কারণেই যাঁরা 'আরিফ' (অর্থাৎঐশী তত্ত্বদর্শী) তাঁরা যদি কঠিন বিপদ ও সংকটাবলীর আঘাতের পর আঘাতে উত্যেক্ত ও বিধ্বস্তও হয়ে পড়েন তবুও তাদের ওপর নৈরাশ্যের হৃদয়বিদারক অবস্থা আপতিত হয় না। কেননা তাঁরা পাকাপোক্ত দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে হৃদয়ঙ্গম করে থাকেন যে সেই 'মৌলা করীম' (দয়াময় প্রভু আল্লাহ্) অনেক বেশি দোয়া শ্রবণকারী ও সর্বশক্তিমান। আর তখনই প্রকৃতপক্ষে মানুষের আস্বস্ত হবার এমন সৌভাগ্য লাভ হয় যে সে দৃঢ়বিশ্বাস রাখে, তিনি 'রহমান' (অযাচিত দানকারী, অসীমদাতা) এবং সর্বসক্ষম। আর সে নিশ্চিত জানে যে তার খোদা 'করীম' ও 'রহীম' (মহানুভব ও বার বার কৃপাকারী)। হে মহান মহামহীম খোদা তুমি আমাদের সবাইকে শক্তিশালী ইয়াকীন (দৃঢ়বিশ্বাস) দান কর, যার দরুন আমরা সর্বক্ষণই প্রশান্তি ও সুখানুভুতিতে অবস্থান করি। 'আমীন সুম্মা আমীন'।

গুজরাত থেকে আরও দশ টাকা পৌঁছেছে। এখন জানা গেছে প্রেরণকারী মহোদয়ের নাম আতা মুহাম্মদ। তিনি গুজরাত জেলায় মুক্তারী করেন। এখন ইনশাআল্লাহ্ ষাট টাকার রশিদ তাঁর খিদমতেও পাঠানো হবে। এখানে আর সব রকম মঙ্গল রয়েছে।

ওয়স্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ১১ জুলাই ১৮৮৭ইং

অনুবাদ- মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্

কাদিয়ান আওর উসকে মোকাদ্দাস মোকামাত

(কাদিয়ান ও এর পবিত্র স্থানসমূহ)

(শেষ কিস্তি)

হুসিয়ারপুর

হুসিয়ারপুর পাঞ্জাবের একটি প্রসিদ্ধ শহর। এই শহর এ জন্য গর্বিত ও সম্মানিত যে, এর একটি গৃহে সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম চল্লিশ দিন ইবাদত করেন। এরপর তিনি এই শহর থেকেই ১৮৮৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারীর বিখ্যাত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন।

কাদিয়ান থেকে হুশিয়ারপুরের দূরত্ব ৭০ কিলোমিটার। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ১৮৮৬ সালের ২২শে জানুয়ারী হুশিয়ারপুর যাওয়ার সময় নৌকায় করে বিপাশা নদী পার হয়েছিলেন। এখন এর ওপর পাকা সেতু তৈরী হয়ে গেছে। এর ফলে কাদিয়ান থেকে হুশিয়ারপুর ট্যাক্সি যোগে দেড় দুই ঘন্টায় পৌঁছানো যায়। ১৮৮৬ সালের ২২শে জানুয়ারী যখন হুযূর আলাইহিস সালাম চিল্লাকশীর জন্য গিয়েছিলেন তখন তাঁর (আঃ) সাথে হযরত মৌলবী আব্দুল্লাহ্ সাহেব সানাউরী (রাঃ), হযরত শেখ হামেদ আলী সাহেব (রাঃ) এবং মিঞা ফতেহ্ খান সাহেবও ছিলেন। হুশিয়ারপুরের জমিদার শেখ মেহের আলী 'তাবিলা' নামে খ্যাত তার একটি গৃহ খালি করে দিলেন। তিনি (আঃ) এই গৃহের একটি কক্ষে চল্লিশ দিন দোয়া করেন। তিনি (আঃ) নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন কেউ যেন উপর তলায় তাঁর কাছে না যায় এবং খাবার যেন ওপরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তিনি খাবার খেলেন কি না সেজন্য যেন অপেক্ষা করা না হয় এবং খালি বাসন-কোসন যেন অন্য সময় নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর আরো নির্দেশ ছিল, নামায ওপরেই পড়ে নিবেন এবং বাকী সকলে যেন নীচে পড়ে নেয়। জুমুআর জন্য হযরত সাহেব (আঃ) বলেন, "কোন বিরান মসজিদ খুঁজে বের কর, যা হবে শহরের এক দিকে। সেখানে আমরা পৃথকভাবে নামায পড়বো।" প্রকৃতপক্ষে শহরের বাইরে একটি বাগান ছিল। সেখানে একটি মসজিদ ছিল। সেখানে জুমুআর দিন হুযূর (আঃ) চলে যেতেন এবং আমাদের নামাযে ইমামতি করতেন এবং খোৎবাও নিজে পড়তেন।

চিল্লাকশীর পর তিনি (আঃ) আরো বিশ দিন হুশিয়ারপুরে থাকেন। এই দিনগুলোতে লালা মুরুলী ধরের সাথে তাঁর (আঃ) বাহাস্ যা 'সুরমায়ে চাশম আরিয়াতে' লিপিবদ্ধ আছে। দু'মাসের মেয়াদ যখন পূর্ণ হয়ে গেল তখন হুযূর সেই রাস্তা দিয়েই কাদিয়ান ফিরে আসেন, যে রাস্তা দিয়ে তিনি গিয়েছিলেন। ১৮৮৬ সালের ১৭ই মার্চ তিনি কাদিয়ান পৌঁছে গেলেন। হযরত মৌলবী আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রাঃ) বলেন ঃ-

"হুশিয়ারপুর থেকে পাঁচ ছয় মাইল দূরে এক বুযুর্গের কবর রয়েছে। সেখানে সামান্য বাগান রয়েছে। সেখানে পৌঁছে হুযূর কিছুক্ষণের জন্য পাল্কী থেকে নেমে আসলেন এবং বললেন, এটা একটা উত্তম ছায়াঘেরা স্থান। এখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করবো। এরপর হুযূর (আঃ) কবরের দিকে চলে গেলেন। আমি পিছনে পিছনে গেলাম। আর শেখ হামেদ আলী ও ফাতেহ্ খান পাল্কীর কাছে থাকলেন। তিনি (আঃ) কবরস্থানে পৌঁছে এর দরজা খুলে ভিতরে গেলেন।এবং কবরের মাথার দিকে দাঁড়িয়ে কবরবাসীর জন্য হাত উঠালেন এবং কিছুক্ষণ দোয়া করতে থাকলেন। এরপর তিনি ফিরে এলেন এবং আমাকে সম্বোধন করে বলেন, আমি যখন দোয়ার জন্য হাত উঠালাম তখন যে বুজুর্গের এই কবর তিনি কবর থেকে বিরিয়ে নতজানু হয়ে আমার সামনে বসে পড়লেন। আপনি যদি সাথে না থাকতেন তাহলে তাঁর সাথে আমি কথাবার্তাও বলতাম। তাঁর চোখ ডাগর ডাগর এবং রং শ্যামলা।

অতঃপর তিনি (আঃ) বলেন, দেখ এখানে যদি কোন দরবেশ থাকে তাহলে তার কাছে এই ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞেস কর। বস্তুতঃ হুযূর (আঃ) দরবেশের কাছে জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, আমি এই ব্যক্তিকে স্বয়ং দেখিনি। কেননা ইনি প্রায় একশত বছর পূর্বে মৃত্যু বরণ করেছেন। তবে হ্যাঁ আমার বাপদাদার কাছে শুনেছি, এই ব্যক্তির রং ছিল শ্যামলা এবং চোখ ছিল ডাগর ডাগর এবং এ অঞ্চলে তাঁর খুব প্রভাব ছিল।"

(সিরাতুল মাহদী, প্রথম খন্ড, বর্ণনা ৮৬)

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ঘোষণা অনুযায়ী হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব রাযিয়াল্লাহুতাআলা আনহু ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী সঠিক সময়েই জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি (রাঃ) ১৯৪৪সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী কিন্কমন্ডীর সুবিস্তৃত বেষ্টনীতে তাঁর "মুসলেহ্ মাওউদ" হওয়ার ঘোষণা করেন এবং সম্মিলিত দোয়ার জন্য চিল্লাকশীওয়ালা পবিত্র কক্ষে চলে গেলেন। এর বর্ণনা তারীখে আহমদীয়াত, নবম খন্ড, ৫৯০ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে।

পবিত্র কক্ষে সম্মিলিত দোয়া

হযরত সৈয়্যদনা আল্ মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) তাঁর প্রভাব সৃষ্টিকারী বক্তৃতার পর চিল্লাকশিওয়ালা পবিত্র ও বরকতমন্ডিত কক্ষে চলে গেলেন। সে সময় এই কক্ষটি এক সম্মানিত হিন্দু শেঠ হরকিষণ দাসের মালিকানায় ছিল। তিনি ইহা শেখ মেহের আলী সাহেবের কাছ থেকে ক্রয় করে এর ওপর একটি গৃহ নির্মাণ করেন এবং এর ওপরের অংশ সবুজ রং করে দিয়েছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের চিল্লাকশিওয়ালা কক্ষ এর প্রকৃত আকারে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এই সময়েই এবং এই ভিতের ওপরেই একটি কক্ষ নির্মিত ছিল। শেঠ সাহেব খুব খুশি হয়ে এখানে দোয়া করার অনুমতি দিলেন। বরং তিনি নাযের দাওয়াতুন তবলীগ হযরত মৌলবী আব্দুল মুখনী খান সাহেবের মাধ্যমে ইচ্ছা ব্যক্ত করেন যে, হযরত মির্যা সাহেব যদি এখানে আসেন তবে সেটা হবে তার নিতান্ত সৌভাগ্য। প্রকৃতপক্ষে হুযূর (রাঃ) যখন গৃহে আগমন করেন তখন জনাব শেঠ সাহেব এবং তার পরিবারের অন্যান্য লোকেরা খুবই সম্মান ও সম্ভাষণের সাথে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং গৃহের অন্য কোনে অবস্থিত একটি বড় সজ্জিত কক্ষে হুযূর (রাঃ) কে বসান এবং হুযূর (রাঃ) এর সামনে ফল

পরিবেশন করেন এবং তার পরিবারের লোকদের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর হুযূর (আঃ) পবিত্র কক্ষে চলে গেলেন এবং কেবলার দিকে মুখ করে নতজানু হয়ে বসে তসবীহ্ ও তাহমীদ করতে লাগলেন। এই কক্ষে সেই সময় জামাতের পক্ষ থেকে কার্পেটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

স্থানের অপ্রতুলতার দরুন হযরত আমীরুল মু'মেনীন আল্ মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ছাড়া পঁয়ত্রিশ জন বন্ধু এই কক্ষে গমন করেন। এঁদেরকে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশির আহমদ (রাঃ) সুশৃংখলভাবে একজন একজন করে ভিতরে পাঠান।

এঁরা হলেন ঃ-

(১) হযরত সাহেবযাদা মির্যা শরীফ আহমদ (রাঃ), (২) হযরত সাহেবযাদা হাফেজ মির্যা নাসের আহমদ সাহেব, (৩) সাহেবযাদা মির্যা মনোয়ার আহমদ সাহেব, (৪) সাহেবযাদা মির্যা খলিল আহমদ সাহেব, (৫) সাহেবযাদা মির্যা হাফিজ আহমদ সাহেব, (৬) সাহেবযাদা মির্যা রফি আহমদ সাহেব, (৭) সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেব, (৮) সাহেবযাদা মির্যা হামীদ আহমদ সাহেব, (৯) সাহেবযাদা মির্যা মোবাশ্বের আহমদ সাহেব, (১০) সাহেবযাদা মির্যা মজিদ আহমদ সাহেব, (১১) সাহেবযাদা মির্যা মনসূর আহমদ সাহেব, (১২) হযরত খান মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব (রাঃ), (১৩) সাহেবযাদা মাসুদ আহমদ খান সাহেব, (১৪) সাহেবযাদা আব্বাস আহমদ খান সাহেব, (১৫) হযরত মৌলানা শের আলী সাহেব (রাঃ), (১৬) হযরত মৌলানা সৈয়দ সারুয়ার শাহ্ সাহেব (রাঃ), (১৭) হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব (রাঃ), (১৮) হযরত হাফেজ মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব কাদিয়ানী (রাঃ), (১৯) হযরত হাফেজ মোখতার আহমদ সাহেব শাহজাহানপুরী, (২০) হযরত মৌলবী গোলাম রসূল সাহেব রাজেকী (রাঃ), (২১) হযরত মৌলবী আব্দুর রহিম সাহেব দর্দ (রাঃ), (২২) জনাব শেখ বশীর আহমদ সাহেব, এ্যাডভোকেট, লাহোর, (২৩) হযরত ডাঃ হাসমত উল্লাহ্ সাহেব (রাঃ), (২৪) মৌলবী আব্দুল মান্নান সাহেব, এম, এ, (২৫) হযরত চৌধুরী ফতেহ্ মুহাম্মদ সাহেব (রাঃ), এম, এ, (২৬) হযরত মৌলবী আব্দুল মুখনী খান সাহেব (রাঃ), (২৭) হযরত খান সাহেব মৌলবী ফরজন্দ আলী সাহেব (রাঃ), (২৮) হযরত ডাঃ সৈয়্যদ গোলাম গাউস শাহ্ সাহেব (রাঃ) কাদিয়ান, (২৯) মিঞা ফিরোজ দীন সাহেব শিয়ালকোট, (৩০) হযরত হাফেজ নূর মুহাম্মদ সাহেব ফয়েজউল্লাহ্ চেক, (৩১) হযরত শেখ আব্দুর রহমান সাহেব কাদিয়ানী (রাঃ), (৩২)হযরত মুন্সী মুহাম্মদ আল্ দীন সাহেব (রাঃ) খারিয়া, (৩৩) হযরত মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেব জাট (৩৪) জনাব সুফী আবদুল কাদের সাহেব নিয়ায, বি, এ।

এ সকল বন্ধু ছাড়াও হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) ও কক্ষে গমন করেন।

আল্লাহ্র অনুগ্রহে ও দয়ায় দোয়াওয়ালা এই কক্ষ ও দালানের অর্ধেক অংশ সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া কাদিয়ানের মালিকানায় রয়েছে। আজকাল এই কক্ষকে মসজিদরূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। বন্ধুগণ বিপুল সংখ্যায় দোয়ার জন্য এখানে এসে থাকেন।

দারুল বয়াত লুধিয়ানা

সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় আগমনকারী "মসীহ্ মাওউদ" সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'ফাইয়াত-লুবুহু হাত্তা ইউদরিকাহু বিবাবি লুদ্দিন ফাইয়াকতুলাহু (মেশকাত, কেতাবুল ফিতন) যে, সে দাজ্জালের পশ্চাদধাবন করবে এবং একে "বাবে লুধে"(এর শাব্দিক অর্থ হলো তর্কস্থল-অনুবাদক) দেখতে পাবে আর একে (যুক্তি-প্রমাণের ও দোয়ার সাহায্যে) হত্যা করবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী কয়েকদিক থেকে পূর্ণ হয়েছে এবং হচ্ছে। ঐতিহাসিক দিক থেকেও একটি বর্ণনা লিখিত রয়েছে।

পাঞ্জাব প্রদেশে খৃষ্টধর্মের সূচনা এভাবে হলো,আমেরিকা থেকে দু'জন খৃষ্টান মিশনারী ১৮৩৩ সালের ১৫ই অক্টোবর কোলকাতা পৌঁছল। গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং এর ইচ্ছানুযায়ী সেখানে এই সিদ্ধান্ত হলো যে, ইংরেজ রাজত্বের সীমান্তে একটি মিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে পাদ্রী জে, সি, লোরী ১৮৩৪ সালের ৫ই নভেম্বর লুধিয়ানা পৌঁছে গেল এবং সেখানে ইংরেজ শাসকবর্গ তাকে মিশন প্রতিষ্ঠায় সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিল। তারা তাকে জমি দিল। আর এভাবে পাঞ্জাব প্রদেশে ১৮৩৭ সালে লুধিয়ানায় প্রথম খৃষ্টান গীর্জা নির্মিত হলো। আল্লাহ্তাআলার অদ্ভুত আচরণ দেখুন। তিনি এই লুধিয়ানা শহরেই হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মাধ্যমে ১৩০৬ হিজরীর রজব মোতাবেক ১৮৮৯ সালের ২৩শে মার্চ আহমদীয়া জামাতের ভিত্তি রেখে দাজ্জাল হত্যা অভিযানের সূচনা করে দেন। আর এ শহরের প্রথম শব্দও "লুধ"। যে জামাতের নাম লুধিয়ানায় রাখা হয়েছে সেই জামাতই সারা বিশ্বে বিস্তৃত হয়ে দাজ্জালের মূলোৎপাটন করছে।

গৃহের যে কক্ষে তিনি (আঃ) সর্বপ্রথম মৌলানা নূর উদ্দিন সাহেব (রাঃ) এর বয়াত নিলেন এবং জামাতের ভিত্তি স্থাপন কররেন তাকে 'দারুল বয়াত' বলা হয়। এই গৃহটি ছিল হযরত সূফী আহমদ জান সাহেবের (রাঃ)। তিনি সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামের প্রতি গভীর ভালবাসা পোষণ করতেন। কিন্তু জামাত প্রতিষ্ঠার পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর কন্যার সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল রাযিয়াল্লাহুতাআলা আনহুর বিয়েও হয়েছিল। সুফি সাহেব (রাঃ) এর পুত্রগণ এই গৃহটি সদর আঞ্জুমানের নামে দান পত্র করে দেন। সদর আঞ্জুমান এই গৃহের ব্যবস্থাপনা স্থানীয় জামাতের ওপর সোপর্দ করে দেয়। ১৯১৬ সালে এর প্রথম আকৃতিতে কিছু পরিবর্তন করে উত্তর দিকে একটি লম্বা ও পাকা এবং আলো-বাতাস খেলে এমন একটি কক্ষ তৈরী করে দেয়া হলো। এর উত্তর দিকের প্রাচীরের বর্হিদেশে 'দারুল বয়াত' নাম এবং ঐতিহাসিক বয়াতের ফলক লাগানো হয় এবং প্রাঙ্গনে পাকা ইটের আধা হাত উঁচু ছাদ এবং একটি মেহরাব বানিয়ে নামাযের জন্য নির্ধারিত করে দেয়া হলো। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে নামাযগাহে একটি ছোট ধরণের সুন্দর মসজিদ নির্মিত হলো। বৈদ্যুতিক বাতি লাগানো হলো। আঙ্গিনায় নলকুপ বসানো হলো। আর তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে গোসলখানা তৈরী করা হলো। একটি লম্বা কক্ষকে দু'টিতে পরিবর্তন করে পূর্বদিকের কক্ষে আহমদীয়া লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত করা হলো। এই কক্ষের পূর্বদিকের প্রাচীরের দক্ষিণ কোনের পাশে সেই পবিত্র জায়গা অবস্থিত যেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বসে প্রথম বয়াত নিয়েছিলেন এবং জামাত স্থাপিত হয়েছিল। (তারীখে আহমদীয়াত, দ্বিতীয় অংশ, পৃষ্ঠা ১৬৯) *(সমাপ্ত)*

মুহাম্মদ হামিদ কাওসার

অনুবাদ ঃ নাজির আহমদ ভূঁইয়া

যাকাত ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়

(২য় কিস্তি)

জমির উৎপন্ন ফসলের নিসাব ও এর যাকাতের বিধান

ইসলামের আলেমগণ কৃষি জমিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। 'খারাজি' অর্থাৎ সেসব এলাকার জমি যার ওপর মুসলমান তরবারীর বলে কব্জা করেছে কিন্তু সেখানে জমি সৈন্যদের মাঝে বন্টন করার পরিবর্তে সরকারের অধীনে রেখে দিয়েছে এবং চাষাবাদের জন্যে সেসব লোকদের দেয়া হয়েছে যারা এর ওপর দখল স্বত্বেও মালিক বনে ছিল। এমন জমির শস্যের ওপর যাকাতের পরিবর্তে খারাজ অর্থাৎ খাজানা ধার্য হবে। যার নিয়ম-নীতি অবস্থা ও সরকারের প্রয়োজনের দিক থেকে পরিবর্তিত হতে থাকে।

জমির দ্বিতীয় শ্রেণীকে 'উশরি' বলা হয়। যেমন হেজায অঞ্চলের জমি বা যেসব এলাকার জমি মুসলমান সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয়েছে আর তাদেরকে এর মালিক বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এমন জমির উৎপাদনের ওপর 'উশরি' ১/১০ যাকাত হিসেবে দেয়া অবশ্য-কর্তব্য হবে। তবে শর্ত এই, বৃষ্টির ওপর নির্ভশীল হয় আর উৎপাদিত শস্য ৫ ওয়াসক * (আনুমানিক ২১ মন)। উৎপাদন যদি এথেকে কম হয় তাহলে এর ওপর যাকাত ধার্য হবে না। অবশ্য উৎপাদন যদি ২১ মন বা এথেকে অধিক হয় তাহলে এর দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে। জমিতে যদি কূঁয়ো বা খাল অথবা ঝরণার পানিতে সেচ দেয়া হয় তাহলে যাকাতের নিয়ম অর্ধ-দশমাংশ অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ। এ যাকাত দেয়া তখন আবশ্যিক হবে যখন এ জমি থেকে সরকার খাজানা আদায় না করে। খাজানা যদি নিরূপিত হয়ে থাকে তাহলে পরে নীতিগতভাবে যাকাত দেয়া আবশ্যিক হবে না। কেননা, একই জিনিস থেকে দু'বার স্থায়ী ট্যাক্স আদায় করা যেতে পারে না।

যেভাবে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে, নীতিগতভাবে জমির সেই ফসলের ওপর যাকাত দিতে হবে যা মজুদ করা যায় যেমন, শস্য, শুকনো ফল যেমন, খেজুর, কিসমিস প্রভৃতি। কিন্তু যেসব ফসল মজুদ করা যায় না যেমন, সব্জী বা খরবুজা বা তাজা ফল প্রভৃতি তখন এগুলোর ওপর যাকাত আদায় জরুরী নয়।

জমি যদি ভাগে দেয়া হয় তাহলে এজমালী ফসল থেকে যাকাত আদায় করতে হবে। এরপর জমির মালিক ও ভাগীদারের মাঝে অবশিষ্ট ফসল বন্টন করা হবে।

জংলী মধু, যার ব্যাপারে মৌমাছি পালনের জন্যে মানুষকে টাকা-পয়সা ব্যয় করতে হয় নি সেক্ষেত্রে ১০ মশক সমান আহরিত হলে এক মশক যাকাত হিসাবে অবশ্য-দেয় হবে। সুতরাং মধুর নিসাব ১০ মশক স্বীকার করা হয়। মৌমাছি পালনের মাধ্যমে যে মধু আহরিত হয় এর যাকাত নেই।

পশুর নিসাব ও যাকাত আদায়ের নিয়ম

যাকাতের পশু অর্থে গৃহপালিত পশু যেমন, উট, গাভী, মোষ, বলদ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা প্রভৃতি। ঘোড়া খচ্চর ও গাধার প্রসঙ্গে মতভেদ আছে। কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ একে যাকাতের মাল হিসাবে গণ্য করেছেন আবার কেউ কেউ করেন নি। তদুপরি গৃহপালিত পশুর ওপর তখন যাকাত অবশ্য-দেয় হবে যখন এরা প্রাকৃতিক চারণ ক্ষেতে চরবে ও লালিত-পালিত হবে এবং ঘরে তাদের খাবার সরবরাহ করার প্রয়োজন হবে না।

নিসাব

উটের যাকাতের নিসাব পাঁচ। কারও নিকট যদি ৫টি থেকে কম উট থাকে তাহলে এর ওপর যাকাত অবশ্য-দেয় হবে না। এ প্রসঙ্গে যাকাতের বিস্তারিত নিয়মাবলী নিম্নরূপ ঃ

প্রতি ৫ থেকে ৯টি উটের যাকাত ১টি ছাগল বা এর মূল্য

" ১০ " ১৪" " " ২টি " "

" ১৫ " ১৯" " " ৩টি " "

" ২০ " ২৪" " " ৪টি " "

" ২৫ " ৩৫" " " " ১ বছর বয়সের ১টি উটনী বা সমমূল্য

" ৩৬" " ৪৫ " " " ২ বছর বয়সের ১টি উটনি বা সমমূল্য

" ৪৬ " ৬০ " " "৩ বছর বয়সের ১টি উটনী বা সমমূল্য

" ৬১ " ৭৫ " " "৪ বছর বয়সের ১টি উটনী বা সমমূল্য

" ৭৬" " " ৯০" " "২ বছর বয়সের ২টি উটনী বা সমমূল্য

" ৯১" " "১২০" " " ৩ বছর বয়সের ২টি উটনী বা সমমূল্য

এর পর অতিরিক্ত প্রতি ৪০টি উটের জন্যে দু'বছর বয়সের ১টি উটনী এবং ৫০টি উটের জন্যে ৩ বছর বয়সের ১টি উটনী যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

গাভী ও মোষের যাকাত

গাভী ও মোষ একই শ্রেণীভুক্ত। আর এতে বলদ ও পুরুষ মোষও অন্তর্ভুক্ত। অতএব এদের নিসাব ও যাকাতের পরিসীমা এর সম্মিলিত সংখ্যার ওপর নির্ণিত হয়। প্রত্যেক পশুর আলাদা আলাদা সংখ্যার ওপর নয়; তা কোন একটির সংখ্যা নিসাবের সংখ্যা থেকে কম হোক না কেন। এসব পশুর (গাভী ও মোষ) যদি সম্মিলিত সংখ্যা নিসাবের সমান সমান হয় তাহলে যাকাত দেয়া অবশ্য-কর্তব্য। এরপর যেখানে 'গাভী' শব্দ ব্যবহৃত হবে এতে গাভী, বলদ, পুরুষ মোষ ও স্ত্রী মোষ প্রভৃতি সবই অন্ত-র্ভুক্ত হবে।

গাভীর নিসাব ৩০টি। ৩০টির কম পশুর জন্যে যাকাত নেই। আর এসব জন্তুর যাকাতের নিয়ম প্রতি ৩০টি পশুর জন্যে এক বছর বয়সের ১টি গাভী আর প্রতি ৪০টি পশুর জন্যে ২ বছর বয়সের একটি গাভী যেমন ঃ

প্রতি ৩০ থেকে৩৯টি গাভী পর্যন্ত যাকাত হবে ১ বছর বয়সের ১টি গাভী বা এর সমমূল্য

" ৪০ " ৫৯" " " ১টি ২ বছর বয়সের গাভী বা এর সমমূল্য

" ৬০ " ৭৯" " " ১টি ২ বছর বয়সের গাভী বা এর সমমূল্য

" ৮০ " ৮৯" " "১টি ২ বছর বয়সের গাভী বা এর সমমূল্য

" ৯০ " ৯৯" " " ৩টি ১ বছর বয়সের গাভী বা এর সমমূল্য

" ১০০ " ১০৯" " "১টি ২ বছর বয়সের গাভী বা এর সমমূল্য

" ১১০ " ১১৯" " " ২টি ২ বছর বয়সের গাভী ও১টি ১ বছরের বয়সের গাভী বা এর সমমূল্য

" ১২০ " ১২৯" " " ৩টি ২ বছর বয়সের গাভী ও ৪টি ১ বছর বয়সের গাভী বা এর সমমূল্য। আর এভাবে পরবর্তীগুলোর জন্যে হিসাব করতে হবে।

**টীকা ঃ 'ওয়াসাক' এক প্রকার ওজনের নিরিখ। এক ওয়াসাক ৬০ সা' ১৬৫ লিটার। এ পরিমাপে গমের যে পরিমাপ হয় এদিক থেকে নিশ্চিতভাবে এর ওজন দাঁড়ায় এক ওয়াসাক = ৩ মন ১৯ সের ৫৯ তোলা ৫ মাসা ২ রতি। সা' এর পরিমাপের অন্য গবেষণা অনুযায়ী এক ওয়াসাক ৩ মন ৭ সের ৫ তোলা (ইসলাম কা নেযামে মুহাসসিল্‌,পৃষ্ঠা ৯৯)।*

ছাগল ভেড়ার যাকাত

ছাগল, ভেড়া বা এ জাতীয় পশু আর দুম্বা একই শ্রেণীতে গণ্য করা হয়। আর এদের নিসাব ও যাকাতের পরিসীমাও এদের সম্মিলিত সংখ্যার ওপর নির্ধারিত হবে। পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক পশুর ওপর হবে না। পরে যেখানে 'ছাগল' শব্দ ব্যবহৃত হবে এতে ছাগল, পাঠা, ভেড়া, ভেড়ী, দুম্বা, দুম্বী সব অন্তর্ভুক্ত হবে।

ছাগলের নিসাব হলো ৪০টি। এর কম সংখ্যার জন্যে যাকাত দিতে হবে না। আর এগুলোর যাকাতের নিয়ম নিম্নরূপ ঃ

প্রতি ৪০ থেকে ১২০ টি ছাগল পর্যন্ত যাকাত হবে ১টি ছাগল বা এর সমমূল্য

প্রতি ১২১ থেকে ২০০টি ছাগল পর্যন্ত যাকাত হবে ২টি ছাগল বা এর সমমূল্য

প্রতি ২০১ থেকে ৩০০টি ছাগল পর্যন্ত যাকাত হবে ৩টি ছাগল বা এর সমমূল্য

এর বেশি হলে প্রতি ১০০ ছাগলের জন্যে একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। ছাগলের সংখ্যা যদি একশ' পুরো না হয় বরং কম হয় তাহলে অংশের জন্যে কোন যাকাত ধার্য হবে না। অতএব ৩০১ থেকে ৩৯৯টি ছাগলের জন্যে যাকাত হবে ৩টি ছাগলই। অংশের প্রশ্নটি প্রত্যক পশু-উট, গাভী প্রভৃতি সকলের নিসাবের বেলায় কার্যকরী হবে (ফিকাহ্ আহমদীয়া পৃষ্ঠা ৩৬২-৩৬৫)।

বিভিন্ন মসলা-মাসায়েল

বিভিন্ন নিসাব সম্বলিত সম্পদ

কারও কাছে যদি বিভিন্ন রকমের পৃথক পৃথক যাকাতের নিসাবসম্বলিত সম্পদ থাকে কিন্তু ওগুলোর কোনটাই স্বয়ং নিসাব পরিমাণ নয় বরং কম ; এমনকি সবগুলোর সম্মিলিত মূল্য হাজার টাকায় পৌঁছলেও যাকাত অবশ্য-দেয় হবে না। যেমন কারো নিকট ৪টি উট, ২৬টি গাভী, ৩৯টি ছাগল, ৫১ তোলা রূপা আছে এক্ষেত্রে কোনটির ওপরই যাকাত দেয়া হবে না আর সম্মিলিত মূল্যের ভিত্তিতেও যাকাত আদায় করা যাবে না। কেননা, এর মাঝে প্রত্যেক সম্পদের যাকাতের নিসাব আলাদা আলাদা আর তা এ সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত।

'বছর' বলতে কি বুঝায়?

যাকাত অবশ্য-দেয় হওয়ার জন্যে 'বছর' বলতে চান্দ্র বছর বুঝায়। কিন্তু বছরের আরম্ভ বলতে মুহাররম মাস বুঝাবে না বরং যে মাসে নিসাবের সমান কোন সম্পদ মালিকের কর্তৃত্ব,কব্জা ও অধীনে আসবে সেই সম্পদের জন্যে সেই মাস থেকে বছর আরম্ভ হবে। ১২টি চান্দ্র মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর সেই সম্পদের যাকাত ধার্য হবে। বছর শেষ হওয়ার আগেই যদি সম্পদের রকম-ফের হয় তাহলে বছরও বদলে যাবে। অর্থাৎ বছর সেই মাস থেকে আরম্ভ হবে যে মাসে এ নতুন সম্পদ কব্জা ও অধীনে আসে। যেমন এক ব্যক্তির নিকট রবিউল আওওয়াল মাসে ১০ হাজার টাকা আসে। ৬ মাস গত হওয়ার পরে অর্থাৎ শা'বান মাসে তিনি ১০ হাজার টাকার গবাদি পশু কিনেন, এক্ষেত্রে এ সম্পদের ওপর যাকাতের উদ্দেশ্যে গণতি শা'বান মাস থেকে শুরু হবে। এ গবাদি পশু যদি সারা বছর অর্থাৎপরবর্তী রজব মাস পর্যন্ত তার কাছে থাকে তাহলে এগুলোর ওপর যাকাত দেয়া অবশ্য-কর্তব্য হবে। আর বছর শেষ হওয়ার আগে যদি তিনি গবাদি পশু বিক্রি করে দেন আর সেই টাকা দিয়ে ব্যবসায়ের নিয়্যতে বাসন-কোসন ক্রয় করেন, সেক্ষেত্রে বছর সেই মাস থেকে গণনা আরম্ভ হবে যে মাসে তিনি বাসন-কোসন ক্রয় করেছেন।

এভাবে বছরের মাঝামাঝি যদি সম্পদের রকম ফের হয় এবং একটি বছর শেষ না হতে পারে সেক্ষেত্রে সেই মূলধনের ওপর যাকাত দেয়া অবশ্য-কর্তব্য হবে না।

ধন-সম্পদের ওপর যাকাতের একটি উদ্দেশ্য এটাও যে, মজুদদারী এবং মালামাল জমা করে ও সংকট সৃষ্টি করে বিক্রির লালসা সমূলে ধ্বংস

হয়ে যায়। আর মালামাল ত্বরিৎ সরবরাহ করার ও বিক্রি করার অভ্যাস সৃষ্টি হয়।

কারও কব্জায় যদি নিসাব পরিমাণ বা এথেকে বেশি কোন সম্পদ থাকে এবং বছরের মাঝামাঝি নিসাব থেকে কমে যায় কিন্তু বছরের শেষে নিসাবের সমান বা এথেকে বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে চলতি বছরে যাকাত অবশ্য-দেয়। এর ব্যাপারে কোন তারতম্য হবে না। আর বছরের শেষে যতটা সম্পদ মজুদ থাকে এর ওপর যাকাত ধার্য হবে।

বছরের মাঝামঝি যদি মালামাল হারিয়ে যায়, চুরি হয়ে যায়, কেউ ছিনিয়ে নেয় বা অন্য কোন ভাবে মালিকের কব্জা ও অধীন থেকে বের হয়ে যায় কিন্তু বছর শেষ হওয়ার আগেই সেই মাল পাওয়া যায় তাহলে সেই মালামালের ওপর যাকাত দিতে হবে। অবশ্য কয়েক বছর ধরে যদি সেই মালামাল মালিক না পায় অথবা সে কাউকে কর্জ দিয়েছে, বা অলংকার বা গবাদি পশু কারও নিকট বন্ধক রাখা হয়েছে অথবা দোকানদারের টাকা খরিদ্দারের জিম্মায় থাকে তাহলে এসব ক্ষেত্রে কেবল সেই বছরই যাকাত ধার্য হবে যে বছর এ মালামাল দ্বিতীয়বার তার কব্জা বা অধীনে এসেছে।

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছেন, ব্যবসায়ের যে মালামাল ক্রেতার কাছে পড়ে থাকে। এর ব্যাপারে যাকাতের আদেশ কী? এর ওপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"যে মালামাল দোদুল্যমান এর যাকাত নেই, যতক্ষণ মালামাল নিজ দখলে না আসে। ব্যবসায়ীরা নানা প্রকার বৃথা বাহানা প্রভৃতি করে যাকাত থেকে রেহাই পেতে চায়। পরিশেষে তার সামর্থ্যানুযায়ী নিজের খরচও এ মালামাল থেকে বরদাশ্‌ত করা হয়ে থাকে। তাক্‌ওয়ার সাথে নিজের বর্তমান ধন-সম্পদ ও দোদুল্যমান মালামালের প্রতি দৃষ্টি রেখে এবং সমীচীন মনে করে খোদাতাআলাকে খুশি করতে যাবে। কোন কোন লোক খোদাতাআলার সাথেও নানা প্রকার বাহানা করতে থাকে, এটা ঠিক নয় (মজমুআ ফাতওয়া আহমদীয়া, জিলদ, ১ পৃষ্ঠা১২৮)।

নাবালক বা পাগলের ধন-সম্পদ

নাবালক বা পাগলদের অধিকার স্বত্বে যে ধন-সম্পদ রয়েছে যদি তা নিরাপদ ব্যবসায়ে নিয়োজিত করার সুযোগ থাকে আর বিশ্বস্ততার ওপর এ ধন-সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক তা ব্যবসায়ে লাগিয়ে দেয় তাহলে নিয়মানুযায়ী যাকাত দেয়া আবশ্যকীয় হবে। নচেৎ যাকাত আবশ্যকীয় হবে না। কেননা, এমন পরিস্থিতিতে যাকাত ধার্য হলে মূলধনের সবটা এতে খরচ হয়ে যাবে। আর নাবালকের কল্যাণের খাতিরে ধন-সম্পদ জমা রাখার উদ্দেশ্যই মাঠে মারা যাবে।

ফতওয়া

যাকাত কী?

যাকাত কী? ইউয়াখাযু মিনাল উমরাই ওয়া ইউরাদ্দু ইলাল ফুক্বারাই' অর্থাৎ সেই ধন-সম্পদ যা ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে

* ঘোড়া এবং গাধা কি যাকাতের সম্পদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এর যাকাতের শর্ত কী এ প্রশ্নও বিতর্কের বিষয়।

** এ প্রশ্নও ওঠে যে, অন্যান্য নগদ অর্থ ও ফসল যেমন, কার্পাশ, তুলা, আখ, তৈলবীজ, রবার, বিভিন্ন সব্জী, তরমুজ, খরমুজ,বুট, শসা, বিভিন্ন ফল যেমন আপেল, আম, মাল্টা, কিন্নু, কমলা জাতীয় ফল,কলা, বাদাম, আখরোট,পেস্তা, টলগোজা প্রভৃতি এসব উৎপন্ন দ্রব্যের ওপরে যাকাত দিতে হয় কি হয় না এ বিষয়ও দৃষ্টিপটে নিয়ে আসা যায় এবং কিয়াসের নীতির ভিত্তিতে কাজ করে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে।

গরীবদেরকে দেয়া হয়। এতে উচ্চমার্গের সাহনুভূতি শিখানো হয়েছে। এভাবে উঁচু ও নিচুর পারস্পারিক মিশ্রণের ফলে মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা ভাল হয়ে যায়। ধনীদের ওপর এটা আদায় করা অবশ্য-কর্তব্য। ফরয যদি না-ও হতো তাহলেও মানবিক সহানভূতির চাহিদা থাকতো যেন গরীবদের সাহায্য করা হয় কিন্তু এখন আমি দেখছি, প্রতিবেশি যদি অভুক্ত মারা যায় তাহলেও কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, নিজের আরাম-আয়েশের কাজে ব্যস্ত থাকে। যে বিষয় খোদা আমার প্রাণে জাগ্রত করেছেন আমি তা বর্ণনা করতে ক্ষান্ত হতে পারি না। মানুষের মাঝে সহানুভূতি একটি উচ্চ মার্গের গুণ। আল্লাহ্তাআলা বলেন–

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٩٣﴾

অর্থাৎ তোমরা কখনও সেই গুণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ তোমরা নিজেদের প্রিয় বস্তু আল্লাহ্র পথে ব্যয় না কর (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৩)। আল্লাহ্তাআলাকে সন্তুষ্ট করার পদ্ধতি এটা নয়, যেমন, কোন হিন্দুর গাভী রোগাক্রান্ত হয়ে গেলে সে বলে, বেশ এটাকে (দেবতার নামে) মানত করে দেই (অর্থাৎ সদকা দিয়ে দেয়)।

অনেক লোক এমনও হয়ে থাকে বাসি-পচা রুটি যা কোন কাজে লাগে না তা ভিক্ষুককে দিয়ে দেয় আর মনে করে, আমরা দান খয়রাত করেছি। এমন দান আল্লাহ্র নিকট গ্রহণীয় নয়। আর এমন খয়রাত গ্রহণীয় হতে পারে না। তিনি তো পরিষ্কার বলেছেন– (৩ঃ ৯৩)

আসল কথা হলো, কোন পুণ্য তখন পর্যন্ত পুণ্য হতে পারে না যতক্ষণ নিজের প্রিয় ধন-সম্পদ আল্লাহ্তাআলার পথে, তাঁর ধর্মের প্রচারের জন্যে এবং তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবার জন্য ব্যয় না করা হয় [হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)] ফিকাহ্ আহমদীয়া, পৃষ্ঠা ৩৬৬-৩৬৮)।

প্রশ্ন ঃ সোনা থাকলে এর যাকাত কীভাবে আদায় করা যায় অর্থাৎ এর নিসাব কী?

উত্তর ঃ সোনার ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিতে রূপা হলো মাপকাঠি। অর্থাৎ কারো কাছে যদি ৫২.৫ তোলা রূপার সম মূল্যের সোনা থাকে তাহলে এর যাকাত আদায় করা আবশ্যক। তবে শর্ত এই যে, সোনা এমন অলংকার আকারে না হয় যা সাধারণত নিজে ব্যবহার করা হয় আর কখনও কখনও পরে চাইলে কাউকে ব্যবহার করতে দেয়া হয় আর কৃপণতা দেখানো হয় না।

প্রশ্ন ঃ বছরের প্রথমে নিসাব পরিমাণ ধন-সম্পদ ছিলো পরে বছরের মাঝামঝি সময়ে এতে প্রবৃদ্ধি ঘটলে এরকম আধিক্যের কারণে যাকাতের ব্যাপারে আদেশ কী?

উত্তর ঃ বছরের মাঝামাঝি যদি মূলধনে প্রবৃদ্ধি যেমন, ১০ পরিণত হয় ১৫ হাজারে তাহলে যাকাত ১৫ হাজারের ওপরে ধার্য হবে, এমনকি ৫,০০০/= টাকার ব্যাপারটি এমন হয় যে, বছর শেষ হওয়ার এক দু'দিন পূর্বে পাওয়া গেলেও। মোটকথা অতিরিক্ত আয় আগেই মূলধনের অধীন হবে আর এর জন্যে বছর শেষ হওয়ার কোন শর্ত প্রয়োজন হবে না।

প্রশ্ন ঃ সিকিউরিটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, মেয়াদি আমানত (ফিক্সডডিপোজিট) যাকাত দেয়া থেকে রেয়ায়েতযোগ্য। কারেন্ট একাউন্টের কী আদেশ রয়েছে?

উত্তর ঃ ঋণ, মেয়াদী আমানত, সিকিউরিটি জমা প্রভৃতি খাতে বিনিয়োগকৃত অর্থ এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের ওপর যাকাত ধার্য হবে না। তবে যে বছর এসব টাকা পাওয়া যাবে সে বছর এর যাকাত আদায় করতে হবে।

ইমাম মালেক নিজ কিতাব মুয়াত্তা-তে লিখেন ঃ

"আমাদের (অর্থাৎ মদীনার আলেমদের) দৃষ্টিতে এ মসলা মুত্তাফাকুন আলায়হে অর্থাৎ সবার একমত যে, ঋণীর নিকট কয়েক বছর ধরে ঋণ রয়েছে এর ওপর যাকাত নেই। যে বছর এ ঋণ আদায় হবে কেবল সেই বছরের যাকাত আদায় করতে হবে (শরাহ্ মুয়াত্তা মালেক, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৫)

ঋণের বেলায় যে নীতি, মেয়াদি আমানত, সিকিউরিটি জমা প্রভৃতির বেলায় তা-ই। ইমাম মালেক তাঁর চিন্তাধারার সমর্থনে হাদীসও উপস্থাপন করেছেন।

এছাড়াও যাকাত প্রদানের আর একটি উদ্দেশ্য এই ধন-সম্পদ মালিকের কুক্ষিগত হয়ে না থাকে। বরং মূলধনকে বাধ্য হয়ে ব্যবসায়ে খাটায় বা অন্য কাউকে এথেকে উপকৃত হতে দেয় নতুবা যাকাত তার ধন-সম্পদকে শেষ করে দেবে। বাস্তবত ঋণ মেয়াদি আমানত প্রভৃতির ক্ষেত্রে এ উদ্দেশ্য পুরো হয়ে যায়। এজন্য এমন মূলধনের ওপর যাকাত ধার্য হয় না। তদুপরি এমতাস্থায় যদি যাকাত আবশ্যকীয় হয় তখন কিছু দিন পরে গোটা ঋণ, সব আমানত যাকাত দিতে দিতে শেষ হয়ে যাবে অথচ শরিয়তের উদ্দেশ্য তা নয়।

ঋণের ওপরে যাকাত

"হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কাছ এক ব্যক্তির প্রশ্ন উপস্থাপন করা হলো। কোন ব্যক্তি যদি কাউকে টাকা ঋণ দেয় সেক্ষেত্রে তার ওপর যাকাত অবশ্য দেয়া হবে কি? হুযূর (আঃ) জবাব দেন, না" [আল্ বদর ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭; ফাতাওয়া মসীহ্ মাওউদ (আঃ), পৃষ্ঠা ১২৮]

বাড়ী-ঘর ও মণি-মাণিক্য-এর ওপর যাকাত

"প্রশ্ন করা হলো, একটি বাড়ীতে ৫০০/=টাকার অংশ রয়েছে। এর ওপর যাকাত দিতে হবে কি? হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ "মণি-মানিক্য ও বাড়ী-ঘরের ওপরে যাকাত নেই' [আল্ বদর, ১৪ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭; ফাতাওয়া মসীহে মাওউদ (আঃ) পৃষ্ঠা ১২৮]।

বাড়ী ও ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত ধন-সম্পদের যাকাত

"এক ব্যক্তির পশ্নের উত্তরে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, হাজার টাকার বাড়ী হলেও এর ওপর যাকাত নেই। যদি ভাড়া দেয়া হয় তাহলে আয়ের ওপর যাকাত দিতে হবে। এমনিভাবে ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত ধন-সম্পদ যা বাড়ীতে রাখা আছে– যাকাত নেই।"

হযরত উমর (রাঃ) ৬ মাস পর পর হিসেব নিয়ে থাকতেন আর টাকার ওপর যাকাত ধার্য করতেন" [আল্ বদর, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭, ফাতাওয়া মসীহ্ মাওউদ (আঃ), পৃষ্ঠা ১২৮]।

জামাতী চাঁদাও যাকাত

"প্রশ্ন ঃ চাঁদা আম বা চাঁদা ওসীয়্যত দাতা যদি এ নিয়্যত করে যে, এতে এতটা যাকাতও শামেল আছে তাহলে পরে কি আলাদাভাবে যাকাত আদায় করা জরুরী?

উত্তর ঃ যাকাত তো কমপক্ষে আর্থিক সদকা যা প্রতি অবস্থার প্রেক্ষিতে এর প্রয়োজন হোক বা না হোক সাহেবে নিসাব ব্যক্তিকে আদায় করতে এবং যুগ-খলীফার মাধ্যমে ও অনুমতিক্রমে ব্যয় করতে হয়। কিন্তু চাঁদার ভিত্তি জামাতী সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজনের ওপর। জামাতের প্রয়োজন হলে চাঁদা লাগবে নচেৎ লাগবে না। এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে চাঁদার সাথে যাকাত হিসাব করা সঠিক নয় আর কেন্দ্রীয় বায়তুল মালের নির্দেশও তা-ই (ফেকাহ্ আহমদীয়া, পৃষ্ঠা ৩৬৯-৩৭১)

অনুবাদ- **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

আহমদীয়াত ইয়ানী হাকীকী ইসলাম

(আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলাম)

হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)

(১৫তম কিস্তি)

আলোচনার এই প্রশ্নে ইসলাম ইতিবাচক জবাব দিয়ে থাকে আর আল্লাহতালার সাথে সাক্ষাত করানোর দাবী করে। এ বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ নিম্নোক্ত আয়াত উপস্থাপন করা যেতে পারে। কুরআন করীমের শুরুতেই আল্লাহ্তাআলা বলেন যালিকাল কিতাবু লারাইবা ফীহি হুদাল্লিল মুত্তাকীন। (বাকারা ১ম রুকু) এই কিতাব সেই প্রতিশ্রুত কিতাব যার ওয়াদা পূর্বের কিতাবসমূহে দেয়া হয়েছিল। এতে কোন ধরনের সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং এর প্রমাণ হলো এটি মুত্তাকীদের রাস্তা দেখিয়ে থাকে আর তাদের এই মর্যাদা থেকে উন্নিত করে আরো উপরে নিয়ে যায়। অন্যান্য ধর্ম শুধু মুত্তাকী বানানোর দাবী করে অর্থাৎ বলে, যারা আমাদের রাস্তায় চলবে তারা মুত্তাকী হবে। কিন্তু ইসলাম শুধু মুত্তাকী বানানোর দাবীই করেনি বরং মুত্তাকী থেকেও উন্নিত করে উপরে নিয়ে যায়। ইসলাম কেবল মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্যই বলে দেয় না বরং যখন মানুষ ইসলামের আহকামে আমল করে নিজের সকল প্রচেষ্টা সম্পন্ন করে তখন ইসলাম তাকে আরো উপরে নিয়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি দৃষ্টি থাকে না বরং উভয় দিক হতে এর প্রকাশ হতে থাকে। তেমনিভাবেই একস্থানে বলেন, **মাইইউতিয়ীল্লাহা ওয়ার রাসূলা ফা উলাইকা মায়াল্লাযীনা আনআমাল্লাহু আলাইহিম মিনান্নাবিয়্যিনা ওয়াস্সিদ্দিকীনা ওয়াশ্শুহাদায়ে ওয়াস্ সালেহীনা ওয়া হাসুনা উলাইকা রাফিকা। যালিকাল ফাযলু মিনাল্লাহ। ওয়া কাফা বিল্লাহি আলীম** (নিসা ৯ম রুকু)।

যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর সেই রসূল অর্থাৎ মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর অনুগত্য করবে আল্লাহ্তাআলা তাদেরকে চার শ্রেণীর মর্যাদা দান করবেন যা তারা তাদের প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুযায়ী অর্জন করবে। যে সবচেয়ে বেশি এতায়াতকারী বা আনুগত্যকারী হবে তাদেরকে নবীদের মর্যাদা দেয়া হবে। আর যে এর চেয়ে কম এতায়াতকারী হবে তাদেরকে সিদ্দীক অর্থাৎ নৈকট্যপ্রাপ্তদের মর্যাদা দেয়া হবে। যারা এদের চেয়েও কম এতায়াতকারী হবে তাদেরকে শহীদ অর্থাৎ যাদের চোখের সামনের পর্দা সরে গেছে ঠিক কিন্তু তারা এমন মর্যাদায় পৌছাতে পারেনি যার ফলে তাদেরকে বিশেষ বন্ধু বলা যায়। যারা এদের চেয়েও কম এতায়াতকারী হবে তারা নেকীর অর্থাৎ তারা নিজেদের কর্ম করছে কিন্তু খোদাতাআলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য কোন দরজা বা পথ খোলা হয়নি। এরপর তিনি বলেন এরা সংগী হিসাবে ভাল। যদি মানুষ এদের সাহাচার্য লাভ করে তাহলে তারাও সংশোধন হতে পারে। আল্লাহ্তাআলার পক্ষ থেকে এই প্রতিশ্রুত পদমর্যাদা তাঁর ফযল সরূপ। আর আল্লাহ্ বান্দা সম্বন্ধে সম্মক অবহিত। অর্থাৎ আল্লাহ্তাআলা এ বিষয় সম্পর্কে অবহিত আছেন, মানুষের মাঝে তাঁরই সৃষ্টিকৃত অসীম উন্নতির আকাঙ্খা রয়েছে আর প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাতের অস্তিরতাও তাদের মাঝে রাখা হয়েছে তাই এই আকাঙ্খাকে পূর্ণ করা আল্লাহ্তাআলার জন্য আবশ্যক ছিল। সুতরাং তিনি তাঁর ফযলের উপকরণ সমূহ সহজলভ্য করে দিলেন। এখন যে বান্দা চাইবে এসব উপকরণ হতে উপকার উঠাতে পারে।

অপর এক জায়গায় আল্লাহ্তাআলা বলেন, **ইন্নাল্লাযীনা লা ইয়ারজূনা লিক্বায়ানা ওয়া রাযূ বিল হায়াতিদ দুনইয়া ওয়াত্মায়ান্না বিহা ওয়াল্লাযীনা হুম আন আয়াতেনা গাফেলূন, উলাইকা মা'ওয়া হুমুন নার বিমা কানু ইয়াকসিবূন**। (ইউনুস রুকু ১)

অপর এক জায়গায় আল্লাহ্তাআলা বলেন, **ওয়ালেমান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতান** (রহমান রুকু ৩) যারা আল্লাহ্তালার মর্যাদাকে জেনে নেয় আর সে অনুযায়ী কাজ করে তাদেরকে দুটি জান্নাত দেয়া হয়। অর্থাৎ একটি এই দুনিয়াতে অন্যটি মৃত্যুর পর। অপর এক জায়গায় জান্নাতের উত্তম নেয়ামতের মধ্য হতে একটি উল্লেখ করেন- **ওজুহুই ইয়াওমাইযিন নাজেরাতুন ইলা রাব্বিহী নাযেরাতুন।** (কেয়ামাহ রুকু ১) যারা জান্নাতে থাকবে তাদের চেহারা খুবই উৎফুল্ল থাকবে কেননা তখন তারা তাদের প্রভুকে দেখতে থাকবে। সুতরাং এ দুনিয়াতে জান্নাত পাবার অর্থ হলো পরকালে তারা খোদাতালার দর্শন ও সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করা এবং নিজ আধ্যাতিক দৃষ্টি দ্বারা তার সীফতের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবে আর এগুলোকে নিজের নফসে জারী অবস্থায় পাবে।

আল্লাহ্তাআলা বলেন, **উযকরুনী আযকুরকুম ওয়াশকুরুলী ওয়া লা তাকফুরুন**। (বাকারা-১৮ রুকু) তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে সাক্ষাত লাভ পর্যন্ত উন্নতি দিব আর আমার শুকুর গুযারী কর, আমার নেয়ামতের অস্বীকার করো না। অর্থাৎ যখন দুনিয়াতে আমি আরামের এত উপকরণ সৃষ্টি করেছি তাহলে আসল ইচ্ছা সে ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে কেন পূর্ণ করব না?

এখন প্রশ্ন উঠে ইসলাম এই সাক্ষাত ও দর্শনের অবস্থা কী বর্ণনা করে? এর উত্তর হলো এমন সূক্ষ্ম জিনিসের অবস্থার বিবরণ দেয়া মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে। সেই অবস্থা কেবল মনে অনুধাবন করার সাথে সম্পৃক্ত। যে ব্যক্তি এই অবস্থাকে লাভ করে সে-ই একে বুঝতে পারে; অন্যকে এই অবস্থা বুঝানো এত সহজ নয় কেননা এটি এক নতুন অবস্থা। মানুষ তো কেবল তার জীবনে যেসব অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেই অবস্থাকেই বুঝতে পারে, যেমন যে ব্যক্তি মিষ্টি খেয়েছে তাকে আমরা বলতে পারি, মিষ্টির স্বাদ কেমন। যখন আমি বলব, উমুক জিনিসে মিষ্টি আছে তৎক্ষণাত তার মস্তিষ্কে মিষ্টি খেলে তার যে অনুভূতি হতো সেই অবস্থার সৃষ্টি হবে কিন্তু যে কখনও মিষ্টি চোখেও দেখেনি যদি তাকে ইশারায় বুঝানো হয় তাহলে হতে পারে সে বুঝে নিবে কিন্তু এরপরও সে এই অনুভূতি বা অবস্থাকে ভালভাবে বুঝতে পারবে না। হ্যা মিষ্টির কিছু গুণাগুণ যা অন্যান্য জিনিসে পাওয়া যায় যেমন চটচটে, রসালো ইত্যাদি এর মাধ্যমে আমরা তাকে বুঝাতে পারব, মিষ্টি লবণাক্ত জিনিস হতে ভিন্ন ধরনের স্বাদ রাখে। কিন্তু তাকে বুঝানোর প্রকৃত পদ্ধতি হবে তার মুখে এক টুকরো মিষ্টি তুলো দেয়া আর বলা, এটা হলো মিষ্টি। ঠিক তেমনিভাবে খোদাতালার সাথে

সাক্ষাতের স্বাদও ভাষায় বুঝানো যাবে না। হ্যা যেহেতু এ বিষয়টি সকল আধ্যাত্মিক উন্নতির কেন্দ্র। আল্লাহ্‌তাআলা এর এমন সব লক্ষণাবলী সৃষ্টি করে দেন যাতে ভালভাবে স্পষ্ট হয়ে যায়, উমুক ব্যক্তি জীবন্ত খোদার সম্পর্ক ও তার দর্শন লাভ করেছে। ঠিক তেমনিভাবে এক জড় বস্তু দ্বারা নির্মিত মেশিনকে যখন বিদ্যুতের সাথে সংযোগ দেয়া হয় তখন এর ভিতর একপ্রকার শক্তির সৃষ্টি হয়, যারা এটা দেখছে তারা বুঝে নেয় এখন কোন বড় ক্ষমতা সম্পন্ন জিনিসের সাথে এর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন হতেই আল্লাহ্‌তাআলার সাক্ষাতের লক্ষণাবলী প্রকাশিত হয়ে আসছে আর এখনও হচ্ছে। নূহ, ইব্রাহীম, মুসা, মসীহ (আঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং বাকি সকল নবীদের ক্ষেত্রে খোদাতালার সাথে তাদের সম্পর্কের অবস্থা তাদের মাঝে খোদাতালার সিফাতের জ্যোতির প্রতিফলন দ্বারাই প্রকাশিত হয়েছে। এই একমাত্র পদ্ধতি ছাড়া খোদাতালার সাথে তাদের যে সম্পর্ক ছিল সেই সম্পর্কের অনুভুতি না সেই যুগের কেউ বুঝতে পেরেছে না এখন বুঝতে পারবে।

মূল কথা হলো যেহেতু আল্লাহ্‌তাআলার সত্তা অদৃশ্য তাই তাঁর সম্পর্ক এবং তাঁর দর্শন সিফাতের প্রতিফলনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। রসূলে করীম (সঃ) বলেন, তাখাল্লাকু বে আখলাকিল্লাহ্‌ অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহ্‌তাআলার সাক্ষাত চাও তাহলে খোদাতালার সিফাতকে নিজের মাঝে ধারণ কর আর খোদার সীফত অনুযায়ী নিজের আখলাক গড়ে তুলো।

স্মরণ রাখা উচিত, অদৃশ্য স্বত্তার সাথে সম্পর্ক তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমেই হতে পারে। কুরআন করীম তত্ত্বজ্ঞানের বিশ্লেষণে তিন প্রকার জ্ঞানের কথা বলেছে প্রথমতঃ ইলমুল ইয়াকীনঃ অর্থাৎ কোন জিনিস না দেখে শুধু লক্ষনে জেনে নেয়া। দ্বিতীয়তঃ আইনুল ইয়াকীনঃ কোন জিনিস নিজে দেখে নেয় শুধু লক্ষণেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনা। কিন্তু এর প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে সে পুরোপুরি অবহিত নয়। জ্ঞানের তৃতীয় ধাপ হলো এর প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে ততটুকু অবহিত হয় যতটুকু তার পক্ষে অবহিত হওয়া সম্ভব। আর সে এর প্রভাবও নিজের মাঝে পড়তে দেখে।

এই তিন প্রকার জ্ঞানের উদাহরণ তেমনি যেমন যদি কোন ব্যক্তি দূর হতে ধুঁয়া দেখে তাহলে সে জেনে যাবে, সেখানে আগুন জ্বলছে। কিন্তু এর পরও তার পূর্ণ বিশ্বাস হবে না, কেননা কোন কোন সময় চোখও ধোঁকায় পড়ে আর ধুলাকে ধুঁয়া মনে করে, কিন্তু যদি সে নিকটবর্তী হয় এবং আগুনকে দাউ দাউ করে জ্বলতে স্বচক্ষে দেখে তাহলে তার বিশ্বাস বেড়ে যাবে। কিন্তু নিজে আগুন দেখা স্বত্বেও তার হৃদয় আগুনের পূর্ণ অবস্থা বা অনুভূতি সম্বন্ধে অবহিত হবে না কিন্তু যদি সে আগুনের মাঝে হাত দিয়ে দেখে আর এর জ্বলানোর ক্ষমতাকে নিরিক্ষণ করে তাহলে তার বিশ্বাস চরমে পৌছাবে। যদিও এই তিন শ্রেণীর পরও অনেক শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে, কিন্তু প্রধান শ্রেণী বিন্যাস এটিই। এই শ্রেণী সমূহ অর্জনের ইচ্ছা প্রত্যেক স্বভাবের মাঝে রেখে দেয়া হয়েছে। সুতরাং আমরা দেখি, যখন বাচ্চার খানিকটা জ্ঞান হয় তখন অবশ্যই সে একবার আগুনের শিখায় হাত দিয়ে দেখতে চায়, এর প্রভাব কি? আর আমার মনে হয় দুনিয়াতে প্রায় সকল বাচ্চাই এই ইচ্ছায় আগুনের দিকে একবার হাত বাড়ায়।

উপরোক্ত জ্ঞানের তিনটি শ্রেণীই ইসলাম পেশ করে থাকে। ইলাহী তত্ত্বজ্ঞানের প্রথম ধাপ হলো মানুষ তাঁর সীফত সম্বন্ধে উদাহরণস্বরূপ পূর্বের বযুর্গদের ঘটনাবলী পড়ে জ্ঞানার্জন করে, তাদের সাথে খোদাতাআলার এমন এমন সম্পর্ক ছিল। ফলে তার হৃদয়ে এক ধরনের বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়, কোন না কোন ব্যাপার তো অবশ্যই আছে। কিন্তু এই বিশ্বাস এক অস্থায়ী জোশ সৃষ্টি করতে পারে এর বেশি কিছুই করতে পারে না। কেননা যখন সে নিজে এক গলির দিকে পা বাড়ায় আর সেই ব্যক্তির মত দূর থেকে ধুয়া দেখে আগুনের সন্ধানে বের হয় কিন্তু যতই দূরে যেতে থাকে সে শুধু ধুয়াই দেখে কোথাও আগুন দেখতে পায়না আবশেষে নিরাশ হয়ে বসে পড়ে। আর ধারণা করে নেয় এই ধুয়া আমার দেখার ভুল এটি সম্ভবতঃ কোন মেঘের টুকরা বা অন্য কিছু হবে। এভাবেই এসব পুরোনো গল্প-কাহিনী পড়ে জ্ঞানে সন্তুষ্ট হয়ে নিজে চেষ্টা করতে করতে এরা অবশেষে নিরাশ হয়ে যায়। কেবলমাত্র সে ব্যক্তিরাই এসব গল্পে সন্তুষ্ট হয় যারা নিজে কোন কিছু অর্জনের চেষ্টা করে না। আর এ কারণে তাদের এই বিশ্বাস পরিবর্তন হওয়ার কোন সুযোগই থাকে না। কিন্তু এই অবস্থা কখনই ইর্ষাযোগ্য নয়।

ইসলাম মানুষের জ্ঞানকে প্রথম শ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ রাখেনি বরং বর্ণিত তিন ধরনের জ্ঞানের দরজা সর্বদার জন্য উম্মুক্ত রেখেছে। আর ইসলামের ওয়াদা রয়েছে, যখনই কোন ব্যক্তি খোদাতালার পক্ষ থেকে ইসলামের বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী পা বাড়ায় সে নিজ চেষ্টা মোতাবেক জ্ঞান পাবে। আর জ্ঞানের এমন কোন মর্যাদা নেই যা খোদাতালা পূর্ববর্তীদের জন্য খোলা রেখেছিলেন কিন্তু এখন তা বন্ধ করে দিয়েছেন।

আমি বলেছি, প্রকৃত জ্ঞান হলো সেই খালেস অনুভূতি যা মানুষের হৃদয়ে সৃষ্টি হয়। প্রকৃত জ্ঞান হলো রূহানী দৃষ্টির সেই প্রশান্তি যার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে খোদাতালার সীফতের সংমিশ্রণ হিসাবে দেখতে পায়। কিন্তু যেভাবে প্রত্যেক জিনিসের কিছু প্রভাব রয়েছে তেমনি খোদাতালার সাক্ষাতেরও কিছু প্রভাব রয়েছে যার মাধ্যমে মানুষ তার সম্পর্ককে অনুভব করে। আর অন্যরাও এই সম্পর্ককে অনুভব করে। কেননা এ বিষয়টি স্পষ্ট, যখন কোন জিনিস অন্য কোন জিনিসের নিকটবর্তী হয় আর যদি সেই জিনিসের মাঝে কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে তাহলে সেই জিনিসের প্রভাব অন্যটির উপরও পড়বে। যেমন আগুনের পাশে বসলে মানুষ গরম অনুভব করে বরফের কাছে বসলে ঠান্ডা অনুভব করে, সুগন্ধযুক্ত জিনিস ছুলে তার কাপড় থেকে সুগন্ধ ছড়াতে থাকে অথবা বক্তার নিকটবর্তী হলে তার কথার আওয়াজের তরঙ্গ তার কানের পর্দায় ধাক্কা লাগতে শুরু করে আর বক্তার জ্ঞান থেকে কিছু সে গ্রহণ করতে থাকে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি খোদার সাক্ষাত লাভ করে তাহলে তার মাঝে এই সাক্ষাতের কোন না কোন প্রভাব অবশ্যই পাওয়া যাবে যা প্রমাণ করবে, সে প্রকৃত পক্ষে খোদাতাআলার নৈকট্য অর্জন করেছে। *(চলবে)*

মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান
মুবাশ্বের মুরব্বী

খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী

(দ্বিতীয় কিস্তি)

ঐশী জামাতে দীক্ষা গ্রহণের পর চৌধুরী সাহেবের মাঝে বিরাট পরিবর্তন আসে। তিনি হৃদয়ের উচ্ছাসে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তখন বলেছিলেন–'এখন খুশীতে আমার নাচতে ইচ্ছা করছে।' প্রকৃতপক্ষে সে সময় তাঁর মাঝে নূরের পরশে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রেমের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি মসীহ্‌েজ্জামানের এক আশেক হয়ে যান। নিজেকে জামাতের একজন তবলীগকারী সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলতে এবং বঙ্গদেশের বাঙ্গালিদের নিকট নূরের আলো জ্বেলে দিতে তাঁর প্রবল আকাঙ্খা জন্মে। তাই কাদিয়ান থেকে চলে আসার প্রাক্কালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর নিকট হৃদয়ের আকুতি ব্যক্ত করে আরজ করেন-হুযূর আমি বয়াত করলাম বটে কিন্তু ইসলাম ও আহমদীয়ত সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু শিক্ষা প্রয়োজন। দয়া করে যদি একজন মোবাল্লেগ বা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত লোক আমার সাথে দেন তবে বড়ই উপকৃত হবো। তখন হুযূর (রাঃ) মুঙ্গেরের মাওলানা হাকিম খলিল আহমদকে চৌধুরী সাহেবের সাথে দেন (পাক্ষিক আহমদী ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ খৃঃ)।

আবুল হাসেম সাহেব যদিও জাগতিক উচ্চ শিক্ষিত, পান্ডিত্যের অধিকারি এবং উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন। কিন্তু নতুন আধ্যাত্মিক জীবন লাভের পর নিজের আমিত্বকে বিসর্জন দেন। তাই তিনি ধর্মীয় শিক্ষক গুরু হাকিম খলিল আহমদ সাহেবকে বরিশাল নিজ বাসায় নিয়ে এসে তাঁর নিকট থেকে পবিত্র কুরআন, হাদীস ও সুলতানুল কলম থেকে শিক্ষা লাভে ব্রত হন এবং পরিবার পরিজনকেও শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যে তিনি জামাতের একজন বিজ্ঞ আলেম হন এবং স্ত্রী সন্তানগণ ইমামুজ্জামানের আবির্ভাবের সত্যতা উপলব্ধি করে দীক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। মূলতঃ তিনি কাদিয়ান থেকে নিয়ে আসা নূরের আলো নিজ ঘরে জ্বেলে দেন।

উপরন্তু চৌধুরী সাহেব বিশিষ্ট আলেম মাওলানা মুঙ্গেরী সাহেবকে নিয়ে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে

অনেক তবলীগ করেছেন। চষে বেড়িয়েছেন। বিশেষতঃ নাটোরের বংশোদ্ভুত স্বজনদের নিকট এবং বন্ধু মহলে শিক্ষিতজনের কাছে অনেক তবলীগ করেন। তখন বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে যে ক'জন আহমদী ছড়িয়ে ছিলেন তাদের উদ্যোগে প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী তবলীগি অনুষ্ঠান করেছেন। ১৯১৫ সালে তারুয়া গ্রামে যখন মাত্র দু'জন নবদীক্ষিত আহমদী জনাব মুন্সী আহমদ উল্লাহ্ ও মুন্সী আউছাফ আলী ছিলেন তখন তাদের আমন্ত্রণে আবুল হাসেম সাহেব মাওলানা মুঙ্গেরী সাহেবকে নিয়ে তারুয়া যান। সে সময় তারুয়া গ্রামে এক বিরাট বহাসের অনুষ্ঠান হয়। এ মহতী অনুষ্ঠানে প্রতিপক্ষের কুমিল্লার গ্রীলাতলা গ্রামের প্রসিদ্ধ মৌলভী হাসান আলী উপস্থিত ছিলেন। গ্রামের বহু সংখ্যক লোকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ বাহাস অনুষ্ঠানে মাওলানা মুঙ্গেরী সাহেবের অকাট্য যুক্তিতে তারা পরাভূত হয়। ফলে উপস্থিত সত্যানুসন্ধানীদের মাঝে আহমদীয়তের সত্যতা পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। তারুয়া গ্রামে আহমদীয়তের চর্চার সুবাতাস বইতে থাকে। পরবর্তীতে অনেকে দীক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। ফলে ১৯১৬ সালে নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। নব গঠিত জামাতের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন মুন্সী দিয়ানউদ্দিন সাহেব।

১৯১৫ সালের মাঝামাঝি সময় প্রাক্তন বঙ্গীয় আমীর মৌলভী মোবারক আলী সাহেব চট্টগ্রাম শহরে একটি তবলীগি অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে আবুল হাসেম সাহেবের নিকট মাওলানা মুঙ্গেরী সাহেবকে চট্টগ্রাম প্রেরণের অনুরোধ জানান। তখন মৌলভী মোবারক আলী সাহেব চট্টগ্রাম সরকারী মাদ্রাসা হাইস্কুল বর্তমান সরকারী মুসলিম হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তবলীগ পাগল আবুল হাশেম সাহেব তবলীগি অনুষ্ঠানের কথা শুনেই মুঙ্গেরী সাহেবকে বরিশাল থেকে চট্টগ্রাম পৌঁছার ব্যবস্থা করেন। ফলে মাওলানা মুঙ্গেরী সাহেবের বক্তৃতা মালায় চারদিন ব্যাপী প্রত্যহ সন্ধ্যা থেকে রাত ১১/১২টা পর্যন্ত এক হৃদয়গ্রাহী ও প্রাণবন্ত তবলিগী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের অধ্যাপক আব্দুল লতিফ সাহেবসহ শহরের ১০/১২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মূলতঃ ঐশীবাণীর ব্যাখ্যা প্রদানের এ মহতী সভার বক্তৃতা শুনেই অধ্যাপক আব্দুল লতিফ জামাতে আহমদীয়ার সত্যতার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ১৯১৬ সালে দীক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দ্বিতীয় আমীর ছিলেন। চট্টগ্রাম শহরে মাওলানা মুঙ্গেরী সাহেবের মাধ্যমে জামাতে আহমদীয়ার প্রথম অনুষ্ঠিত এ সভার আয়োজনে মৌলভী মোবারক আলী সাহেবের সাথে মৌলভী আবুল হাশেম সাহেবের নাম অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

প্রফেসার আব্দুল লতিফ সাহেব আহমদীয়াত গ্রহণের পর ১৯১৬ সালে এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে কাদিয়ান থেকে আগত চার জন বিশিষ্ট বুযুর্গ সাহাবীদের উপস্থিতিতে এক তবলীগি সেমিনারের আয়োজন করা হলে আবুল হাশেম সাহেব বরিশাল থেকে চট্টগ্রাম ছুটে আসেন এবং প্রচন্ড মোখালেফাতের মাঝে এ তবলীগি অনুষ্ঠানকে স্বার্থক ও সফল করে তুলতে তিনি সতীর্থ বন্ধুদের সাথে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য, সাহসিকতা এবং আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন। তখন কাদিয়ান থেকে আগত অতিথি সাহাবীগণের অবস্থানরত ঘরে মোখালেফাতকারীরা রাতের অন্ধকারে আগুন ধরিয়ে দিলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মৌলভী এমদাদ আলী চৌধুরীর হাত পুড়ে যায়। আবুল হাশেম ও মোবারক আলী সাহেব বিচক্ষণতার সাথে মেহমানদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া আবুল হাশেম সাহেব সরকারী কর্তব্য কাজে যখন বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শনে গেছেন অনেক সময় মাওলানা মুঙ্গেরী সাহেবকে সাথে নিয়ে যান এবং সময় সুযোগে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের শুভসংবাদ অকপটে প্রচার করেন। ফলে বঙ্গদেশের সুধী সমাজে আহমদীয়াতের পরিচিতির প্রবাহ সৃষ্টি হয়।

বিশ দশকে শুদ্ধি আন্দোলনে ভারতের হাজার হাজার মুসলমান যখন হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকে তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) তা প্রতিহত করে ধর্মহারা মানুষকে প্রকৃত শান্তির নীড়ে ইসলামের পথে আহ্বানের উদ্দেশ্যে জামাতে আহমদীয়ার তবলীগ সৈনিক বিভিন্ন রনাঙ্গনে প্রেরণের তাহ্‌রীক করেন। আবুল হাশেম সাহেব তা শুনে লাব্বায়েক বলে

ছোট ভাই আবুল আছেম চৌধুরী খানকে সাথে নিয়ে ভারতের মারকান্যায় চলে যান এবং অনেক পথহারা মানুষকে ভালবাসায় জড়িয়ে সত্যের ও শান্তির পথে অনুপ্রাণিত করে আহমদীয়া জামাতে দীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। এমনিভাবে যেখানে জামাতে আহমদীয়ার কর্মকান্ড এবং খেলাফতের তাহ্‌রীক সেখানেই আবুল হাশেম সাহেবের উপস্থিতি ও অক্লান্ত পরিশ্রমের বিচরণ ছিল।

১৯৩৩ সালে চৌধুরী সাহেব হজ্জব্রত পালনের মাধ্যমে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ পূর্ণাঙ্গ পালনের সৌভাগ্যবান হন। অতঃপর ১৯৩৪ সালে প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার তৃতীয় আমীর হেকীম মৌলভী আবু তাহের মাহমুদ আহমদ সাহেবের পরিবর্তে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) চৌধুরী আবুল হাশেম সাহেবকে চতুর্থ আমীর নিযুক্ত করেন। (মাসিক আহমদী নভেম্বর ১৯৩৭)। তখন তিনি বিভাগীয় স্কুল পরিদর্শক কলকাতায় কর্মরত ছিলেন। তিনি জামাতের ভবিষ্যত পরিকল্পনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক হেডকোয়াটার ব্রহ্মণবাড়িয়া থেকে বঙ্গদেশের সর্ববৃহৎ শহর কলকাতায় স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বিষয়টি হুযূর সানী (রাঃ) খেদমতে পেশ করেন। ঐশী নির্দেশে পরিচালিত হুযূর সানী (রাঃ) বঙ্গীয় হেডকোয়াটার ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে কলকাতার পরিবর্তে ঢাকায় অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরের নির্দেশ দেন। ফলে আবুল হাশেম সাহেব বর্তমান ৪ নম্বর (পূর্বে ১৫ নম্বর) বকশী বাজার রোডস্থ দারুত তবলীগের বাড়ীটি এক হিন্দু ব্যক্তির নিকট থেকে ভাড়া নিয়ে ১৯৩৬ সালের প্রথম দিকে ঢাকায় প্রাদেশিক জামাতের কর্মকান্ড শুরু করেন। ১৯৩৭ সালে হুযূর সানী (রাঃ) দারুত তবলীগ ঢাকায় আরও দু'বছর কায়েম রাখতে আদেশ দেন। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে এটা স্থায়ী হয়। অবশেষে ১৯৪৬ সালে এ ভাড়া বাড়ীটি খরিদসূত্রে জামাতে আহমদীয়া মালিক হন।

আল্লাহ্‌র ওলী আবুল হাশেম খান চৌধুরী সাহেব কর্তৃক ঢাকায় দারুত তবলীগ প্রতিষ্ঠা করা মূলতঃ একটি ঐশী মোজেযা ছিল। এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব বলেন–বাংলার আহমদীয়া জামাতসমূহের ভূতপূর্ব আমীর জনাব আবুল হাশেম খান সাহেবের এমারতকালে কলকাতা শহরের গুরুত্ব বেশি ছিল। তাই জামাতের কাজের সুবিধার জন্য তিনি কলকাতায় বাংলার আহমদীয়া জামাতের কেন্দ্র স্থাপন করতে মনস্থ করেছিলেন। বস্তুতঃ তখনকার অবস্থা দৃষ্টে বাংলার প্রাদেশিক কেন্দ্র কলকাতায় স্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু হযরত আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর খেদমতে প্রস্তাব দিলে তিনি বাংলার জামাতের প্রাদেশিক কেন্দ্র ঢাকায় স্থাপন করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু ঐ সময় ঢাকা শহরে তিন চার জনের অধিক আহমদী ছিলেন না। তন্মধ্যে মাত্র একজন হাকীম আব্দুল বারী সাহেব ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা। হুযূরের নির্দেশ মতে ঢাকা শহরে ৪ নম্বর বকশী বাজার রোডস্থ একখানা বাড়ী ভাড়া করে তাতে প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় অফিস স্থাপন করা হল। অবশেষে ১৯৪৬ সালে ঐ বাড়ী ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকায় খরিদ করে স্থায়ীভাবে এটাকে প্রাদেশিক কেন্দ্রে পরিণত করা হয়। এর এক বছর পর দেশ বিভাগ হলে কলকাতা শহর পশ্চিম বাংলার অন্যান্য জামাতসমূহ এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে এক লৌহ পর্দার অন্তরায় সৃষ্টি হল। আল্লাহ্‌তাআলাকে শত শত মোবারকবাদ যে, আমাদের দূরদর্শী হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর নির্দেশ মতে ঢাকায় কেন্দ্র স্থাপিত হবার ফলস্বরূপ পূর্ব পাকিস্তানের জামাত একটি তৈরী কেন্দ্র পেয়ে গেল। আল্লাহ্‌তাআলা যেমন শিশু জন্মের পূর্ব হতে তার অস্তিত্ব ও জীবিকার জন্য মাতৃস্তনে দুগ্ধ সৃষ্টি করে রাখেন, তেমনি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়ে নতুন রাজধানী স্থাপিত হবার পূর্ব হতে তিনি আপন দুর্বল জামাতের জন্য প্রাদেশিক কেন্দ্র স্থাপিত করে রাখলেন। দেশ বিভাগের পরে এই কাজ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। কারণ তখন যে জমি মাত্র পনর হাজার টাকায় খরিদ করা হয় বর্তমানে (উনিশ ষাট দশকে–লেখক) ঐ জমির মূল্য তিন লক্ষ টাকারও অধিক। এ ঘটনার দ্বারা এক দিকে যেমন এটা প্রমাণিত হয় যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর এ নির্দেশ আল্লাহ্‌তাআলার ইঙ্গিত প্রসূত অন্য দিকে এটা আহমদীয়তের জন্য আল্লাহ্‌তাআলার সাহায্য ও সমর্থনের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। (আহমদীয়াতের সত্যতার নিদর্শনাবলী পৃঃ ১৭, ১৮)।

ঢাকায় দারুত তবলীগ প্রতিষ্ঠা শুরুতেই বঙ্গীয় আমীর চৌধুরী সাহেব কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসেন। তখন তিনি ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় স্কুল পরিদর্শক ছিলেন। ১৯৩৬ সালেই তিনি সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ফলে বঙ্গীয় আমীরের দায়িত্ব পালনে জামাতের কাজে ফানাফিল্লাহ হয়ে যান। বঙ্গদেশের বিভিন্ন শহর ও গ্রামে ছড়িয়ে থাকা জামাতগুলো পরিদর্শনে চাঙ্গা করে তোলেন। পার্থিব জীবনে সরকারী কাজে স্কুলসমূহ পরিদর্শনে বিভিন্ন দিক নির্দেশনায় যেমন জ্ঞানের আলো জ্বেলে দিয়েছেন, ঐশী জামাতের কাজে তাঁর চেয়ে আরো অধিক আত্মনিয়োগে বঙ্গদেশের জামাতগুলোকে নূরের আলোতে প্রজ্জ্বলিত করে তুলেন। তার কর্মতৎপরতায় বিভিন্ন জামাতে নব উদ্দম সৃষ্টি হয়। নির্ধারিত পদ্ধতিতে জামাত গঠন, জামাতের বাজেট প্রণয়ন, তাজনীদ রিপোর্ট তৈরী, তালীম তরবিয়ত ও তবলীগের কাজে প্রাণ চঞ্চলতা ত্যাগে জামাতের সাংগঠনিক কাঠামো সুদৃঢ় হয়। তখন বঙ্গদেশের সদর মুরব্বী ছিলেন আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহে এবং সদর মুরুব্বী ও বঙ্গীয় প্রাদে জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলে মাওলানা মোজাফ্‌ফর উদ্দিন চৌধুরী সাহেব বঙ্গীয় আমীর সাহেব এ বুযুর্গ সদ মুরুব্বীদেরকে নিয়ে সারা বাংলা চষে বেড়িয়েছেন এবং অনেক তবলীগ করেছেন। ফলে তখন বঙ্গদেশে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জাহির হবার সংবাদ প্রচারে জোয়ার আসে। বিভিন্ন বাহাসের অনুষ্ঠানে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তখনকার তবলীগি অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিতে গিয়ে মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব বলেন–

খান বাহাদুর চৌধুরী আবুল হাশেম খান সাহেবের এমারত কালে বহু সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তাতে আহমদীয়াতের আদর্শের প্রচার হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৩৮ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে মাওলানা মোহাম্মদ সলিম সাহেব পেলেষ্টাইনের মিশনারী দুই দিন অনবরত আঠার ঘন্টা আরবী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করে জনসাধারণকে মুগ্ধ ও বিমোহিত করেছিলেন। তিনি আরবীতে বক্তৃতা প্রদান করতে চান নি। তিনি বলেছিলেন, আরবীতে বক্তৃতা প্রদান করলে উপস্থিত জনসাধারণ তা বুঝতে পারবে না। কিন্তু উপস্থিত মৌলবীদের জেদের কারণে তিনি আরবীতে বক্তৃতা প্রদান করেন। কিন্তু বক্তৃতা সম্পূর্ণ বুঝতে না পেরে স্বয়ং মৌলভীরা কিছুক্ষণ পরেই তাঁকে উর্দ্দুতে বক্তৃতা করতে অনুরোধ করতে থাকেন। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত আরবীতে বক্তৃতা দেন। সম্ভবতঃ মৌলভীরা ধারণা করেছিলেন তিনি

আরবীতে বক্তৃতা প্রদান করতে পারবেন না। কারণ তখন তিনি অল্প বয়স্ক যুবক ছিলেন। এতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে আহমদীয়তের একটা বিশেষ সাড়া পড়ে যায়। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক ঈমানবর্ধক ঘটনা ঘটে (পূর্ব পাকিস্তানে আহমদীয়াত পৃঃ ২৫)।

সেকালে তবলীগের উদ্দেশ্যে 'আনসারুল্লাহ' নামে সংগঠন গঠনের বিধান প্রচলিত ছিল। বঙ্গীয় আমীর সাহেব তা পালনে বঙ্গীয় জামাতগুলোকে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে এ সংগঠনের মাধ্যমে অনেক তবলীগ সম্পন্ন হয়। তখনকার তবলীগের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল দল বেঁধে পদ ব্রজে দিনের পর দিন তবলীগ করা এবং সাইকেলে চড়ে দূর দুরান্তে গিয়ে ইসলামের শান্তির বাণী পৌঁছে দেয়া। স্কুল কলেজ বন্ধ হলেই আমীর সাহেবের নির্দেশে যুবক ছাত্ররা তবলীগের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যেতেন। তার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপঃ-

বঙ্গীয় আমীর সাহেবের তাহ্‌রীকে ২৪ ডিসেম্বর ১৯৩৭ সালে জামাতের জেনারেল সেক্রোটারী ও সদর মুরব্বী মাওলানা মোজাফফর উদ্দিন চৌধুরী সাহেবের নেতৃত্বে পাঁচজন কলেজ ছাত্রের একটি দল ঢাকা থেকে তবলীগের উদ্দেশ্যে বের হন। তারা হলেন সর্বজনাব মোস্তফা আলী, আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, মির্যা আলী আখন্দ, মোহাম্মদ আবেদ ও নাজেম আলী। আনসারুল্লাহ সংগঠনের সদস্য এ তবলীগ দল ১২ দিন ব্যাপী দিবা রাত ১৬০ ঘন্টা পদব্রজে ভ্রমনে নিরলস তবলীগ করেন। ঐশী বাণীর পরসা বঙ্গদেশের গ্রামে গঞ্জে বিলিয়ে দেয়ার এ মহতী কাজের সংবাদ বঙ্গীয় আমীর সাহেব হুযূর সানী (রাঃ) খেদমতে পেশ করলে হুযুর পরিব্রাজক দলের কার্যের অত্যন্ত প্রশংসা করেন এবং আন্তরিক মোবারকবাদ জানান (মাসিক আহমদী জানুয়ারী ১৯৩৮)। তাছাড়া ১৯৩৫ সালে কাশ্মীরের কটকের অধিবাসী তবলীগ পাগল মৌলভী মোহাম্মদ হানিফ কোরাইশী সাইকেলে চড়ে তবলীগ করে বঙ্গদেশে আসলে বঙ্গীয় আমীর সাহেব তাঁকে নিয়ে অনেক তবলীগি সভা ও সেমিনার স্বার্থক ও সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন। আখেরী জামানায় আবির্ভূত প্রতিশ্রুত ইমামুজ্জামানের শান্তির বাণী অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন বঙ্গদেশের শহর ও গ্রামে। ফলে অনেকের জামাতে আহমদীয়ায় দীক্ষাগ্রহণের সৌভাগ্য হয়। বিভিন্ন স্থানে জামাত প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

তখনকার সময় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্তৃক সর্বধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত। আমাদের বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীর চৌধুরী সাহেব বঙ্গদেশে এরূপ সম্মেলন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পেলে লুফে নিতেন। তিনি নিজে কিংবা জামাতে আহমদীয়ার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতিনিধি কোন সদর মুরব্বীকে উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে ইসলামের মাহাত্ম এবং যুগ ইমাম আবির্ভাবের সত্যতার উপর বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা করতেন। তাই দেখা যায় ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণের CENTENARY উপলক্ষে PARLIAMENT OF RELIGIONS বা মহা ধর্ম সম্মেলন নামে সাত দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান হয়। এ সম্মেলনে দেশ বিদেশের বহু গন্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গীয় আমীর সাহেব সম্মেলনে বাংলার কিংবদন্তী সদর মুরব্বী আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবকে প্রেরণ করেন। তিনি উক্ত সম্মেলনে 'ইসলামের শিক্ষাই আল্লাহ্‌কে লাভ করার প্রকৃষ্ট পথ' বিষয়ের উপর প্রাঞ্জল ভাষায় হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন (মাসিক আহমদী জুন ৩৭)। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্মকে প্রচারের মাধ্যমে বিশ্বে ধর্মের সাম্রাজ্য সৃষ্টির বিরুদ্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। মহাত্মাগান্ধী সম্মেলন উপলক্ষে দাক্ষিণাত্য হতে প্রশ্ন প্রেরণ করেছিলেন। তার প্রশ্ন হল–বিভিন্ন ধর্মগুলো কি সবই সমান? যেমন আমার বিশ্বাস , অথবা কোন এক বিশেষ ধর্মে সত্য নিবদ্ধ, অন্যান্য ধর্মগুলো হয় মিথ্যা, না হয় সত্য ও মিথ্যায় সংমিশ্রিত? (মাসিক আহমদী জুলাই/৩৭)। সম্মেলনের সভাপতি খৃষ্টান ধর্মালম্বী SIR FRANCIS YOUNG HUSBAND সভাপতির ভাষণে গান্ধীজির প্রশ্নের উত্তরে বলেন– "প্রত্যেক সন্তানের নিকট তার মাতা যেমন জগতের সর্বোৎকৃষ্ট মাতা তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট স্ব স্ব ধর্ম তার নিকট সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম। তাই কোন্ ধর্ম সত্য তা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। তবে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে একটি মৌলিক একতা আছে।" এ বক্তব্যের মাঝেই ঐক্য ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার আহ্বানে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। *(চলবে)*

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

ভূমিকম্প

মাহ্‌দীর আগমনী বার্তাবাহক হে ভূ-কম্পন!
করছো তুমি নিজ কাজ যখন যেথা প্রয়োজন।

মসীহ্ এখন আসলেন ভবে ঘোষিলে তুমি সে বারতা,
কম্পিত হলো ধরনী আর প্রমাণ দিল রবি, শশী তারকা।

কেউ বুঝে আর কেউ বুঝে না ভূ-কম্পনের সারকথা,
রচিছ তুমি শত-সহস্র বেদনা বহুল ইতি কথা।

সদর্পে করছো সত্যের প্রচার চূর্ণ করে অহংকার,-
শক্তির পাঞ্জা লড়ছে যারা পায়ে দলে মানুষের হাহাকার।

ভূ-কম্পনের কম্পন আজ দুনিয়া জুড়ে মহাপ্রলয়-
অন্যায় আর অবিশ্বাসের চরমভাবে হচ্ছে পরাজয়।

ঘানায় ভূ-কম্পন প্রতিষ্ঠা করলো ইমাম মাহ্‌দীর সত্যতা,
চারিদিক তার মহা ধুমধামে ঘোষিছে মাহ্‌দীর বারতা।

দুষ্ট চক্রের সন্ত্রাসী কর্মে পাকিস্তান হয়েছে কলুষিত,
বিনাশিতে চায় তাদের যারা সত্য মাহ্‌দীর অনুগত।

বেপরোয়া সব মাহ্‌দী সেনা বিশ্বাসে তারা অনড় অটল,
ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে মরণকে বরণ করেছে অবিরল।

মুসলিমদের অমুসলিম বলায় ভূট্টো যে গেল নিপাত ;
আহ্‌মদী বিরোধী শ্বেতপত্র প্রচারে জিয়াউল হক হল ধূলিসাৎ।

অপকর্ম, অনাচার আর অধর্মের সুরা আকণ্ঠ করে পান -
চিহ্নিত হয়েছে মৌলবাদীর দল, চিহ্নিত হয়েছে পাকিস্তান।

বহু বছর ধরে নির্যাতিত হয়ে ভবে যাঁরা খাটী মুসলামান,
কাফের ফতোয়া প্রদান করে তাদের, নিজেরা হলো নাফরমান।

ঐশী অনুশাসন অমান্য করে ফতোয়া জারি করে মহা উল্লাসে,
রোযাদার যাঁরা নামায পড়ছিলেন জীবন নাশে তাদের
দারুন রোষে।

কম্পিত হলো খোদার আরশ এ হেন পৈশাচিক আচরণে,
তড়িৎ ঐশী আযাব প্রদান করলেন খোদা সে ক্ষণে।

ভূ-কম্পনের ধ্বংসলীলায় আল্লাহ্ মহান করলেন প্রমাণ,
যুগ-ইমামের অনুসারী সবে এ জগতে খাঁটী মুসলমান।

মাকসুদা রহমান

মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)

আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রকাশ্য ও গোপন (দেহ ও মনের) পবিত্রতা

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে পরিষ্কার জানা যায় যে, না তিনি কখনও কোন খারাপ কথা বলতেন, না কখনও অহেতুক কসম খেয়ে কিছু বলতেন (বুখারী)। আরবের মত দেশে বসবাস করে এই ধরনের চারিত্র্য অর্জন করা ছিল এক অসাধারণ ব্যাপার। এ কথাতো আমরা বলতে পারি না যে, আরবের লোকেরা তখন অভ্যাসগতভাবেই অশ্লীল বা ফাহেসা কথা বার্তা বলতো, কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আরবরা কসম খাওয়ার ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এবং আজও অব্দি আরবদের মধ্যে এই কসম খাওয়ার রেওয়াজ ব্যাপক আকারেই প্রচলিত আছে। কিন্তু রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোদাতাআলার প্রতি এত বেশি আদব বা শিষ্টাচার বজায় রেখে চলতেন যে, অযথা তাঁর নাম উচ্চারণ করাও পসন্দ কতেন না।

পাক-সাফ থাকার প্রতি তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতেন। তিনি প্রায় সময় মেসওয়াক করতেন এবং এ ব্যাপারে – (দাঁত-মুখ পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে) এত বেশি জোর দিতেন যে, কখনো কখনো বলতেন, আমি যদি এই ভয় না করতাম যে, মুসলমানদের কষ্ট হবে, তাহলে আমি প্রত্যেক নামায-এর পূর্বে মেসওয়াক করার হুকুম দিতাম (মিশকাত)।

খানা খাওয়ার পূর্বেও তিনি হাত ধুয়ে নিতেন, খাওয়ার পরেও হাত ধুয়ে ফেলতেন। কুল্লী করতেন। বরং, রান্না করা সব রকমের খাদ্য গ্রহণের পরই তিনি কুল্লি করতেন। এবং রান্না খাবার গ্রহণের পর কুল্লী না করে নামায পড়াকে অপসন্দ করতেন (বুখারী)।

মসজিদ যা মুসলমানদের সমবেত হওয়ার নির্দিষ্ট স্থান, তার পরিচ্ছন্নতার প্রতি তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতেন। এবং মুসলমানদেরকে এই কথা বার বার বলতেন যে, সমবেত হওয়ার বিশেষ দিনগুলোতে –জুমুআর দিনে – মসজিদগুলির পরিষ্কার-পরি চ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখবে এবং সেগুলিতে সুগন্ধি দ্রব্যাদি জ্বালাবে, যাতে বাতাস পরিশুদ্ধ হয় (মিশকাত)। একইভাবে তিনি সাহেবাদেরকে (রাঃ) এই উপদেশ দিতেন যে, সম্মেলনের সময়ে কেউ যেন গন্ধযুক্ত কোন কিছু (পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি) খেয়ে মসজিদে না আসে (বুখারী)।

রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার রখার জন্য তিনি বার বার উদ্বুদ্ধ করতেন। যদি রাস্তার ওপরে কোন ঝড়-জঞ্জা কিংবা ইট পাথর কিংবা ময়লা আবর্জনা কিছু পড়ে থাকতে দেখতেন, তাহলে তিনি তা স্বয়ং নিজ হাতেই রাস্তার এক কোণায় সরায়ে রাখতেন। এবং বলতেন যে, যে ব্যক্তি রাস্তা-ঘাটের পরিচ্ছন্নতার দৃষ্টি দেয় খোদা তার প্রতি খুশী হন এবং তাকে সওয়াব বা পুরস্কার দান করেন (মুসলিম) একইভাবে তিনি বলতেন যে, রস্তায় যেন বিঘ্ন সৃষ্টি করা না হয়। রস্তার ওপরে বসে থাকা, কিংবা রস্তার ওপরে এমন কিছু রেখে দেওয়া বা ফেলে রাখা যাতে পথচারীর কষ্ট হতে পারে, কিংবা রাস্তার ওপারে মল-মূত্র ত্যাগ করা ইত্যাদি কাজ খোদাতাআলার দৃষ্টিতে পসন্দীয় নয় (মেশকাত)।

পানি পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে তিনি সবিশেষ খেয়াল রাখতেন। তিনি সবসময় তাঁর সাহাবাগণকে (রাঃ) এই নসিহত করতেন যে, স্থির পানিতে যেন কোন নোংরা কিছু নিক্ষেপ না করা হয়। তেমনিভাবে, স্থির পানিতে প্রস্রাব-পায়খানা করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন তিনি। (বুখারী)

খানা-পিনায় সরলতা ও তাক্ওয়া (খোদাভীরুতা)

খানা-পিনার ব্যাপারে তিনি [আঁ-হযরত-(সঃ)] সর্বদা অত্যন্ত সরল বা সাদাসিদা ছিলেন। খাবারের মধ্যে লবণ বেশি হলো বা কম হলো কিংবা রান্না খারাপ হলো – এসব ব্যাপারে তিনি কখনই কিছু বলতেন না, বা অসন্তোষ প্রকাশ করতেন না। এ ধরনের খাবার যতটা সম্ভব খেয়ে নিয়ে তিনি বাবুর্চির মনোকষ্ট দূর করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু, যদি খাবার একেবারেই অযোগ্য হয়, তাহলে তিনি হাত সরিয়ে রাখতেন এবং কখনই বলতেন না যে, এই খাবার খেতে আমার অসুবিধা হচ্ছে (বুখারী)।

তিনি যখন খাওয়া শুরু করতেন, তখন খাদ্যের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে বসতেন এবং বলতেন, আমার এ ধরণের ফুটানীর ভাব পসন্দ নয় যে, অনেকে এমনভাবে খানা-পিনা করে যেন খানা-পিনার বিষয়টা তাদের কাছে কোনও ব্যাপারই না। (বুখারী)

তাঁর কাছে যখন (খাবারের) কোন কিছু আসতো তখন তিনি তা সাহাবাদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন এবং নিজেও খেতেন। একবার তাঁর কাছে কিছু খেজুর (নজরানা স্বরূপ) এলো। তিনি হিসাব করে দেখলেন যে, প্রত্যেক সাহাবার ভাগে সাতটা করে খেজুর পড়ে, তিনি সাতটি করেই ভাগ করে দিলেন (বুখারী)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যব-এর রুটিও কখনো পেট ভরে খেতেন না (বুখারী)। একদিন এক রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন যে, কয়েকজন লোক একটি বকরী জবাই করে তার গোশ্ত রান্না (ভুনা) করে দাওয়াতের ব্যবস্থা করেছে। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেয়ে লোকগুলি তাঁকেও দাওয়াত করলো, কিন্তু তিনি সেই দাওয়াত গ্রহণ করলেন না (বুখারী)। তবে তার অস্বীকৃতি এজন্য ছিল না যে, তিনি ভুনা গোশ্ত খেতে পসন্দ করতেন না। বরং তা এজন্যই ছিল যে, তিনি এই ধরনের ব্যবস্থা পসন্দ করতেন না যে, আশে পাশে গরীব দুঃখী মানুষের চলাফেরা করবে, আর এরা কিনা তাদের চোখের সামনেই বকরী ভুনা করে খাবে। নইলে, অন্যান্য হাদীস থেকে তো এটা প্রমাণিত যে, তিনি ভুনা (রোষ্ট) করা গাশ্তও খেতেন।

হযরত আয়েশা রাযি আল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও এক নাগাড়ে তিন দিন পেট ভরে খানা খাননি। এবং এই অবস্থা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাত পর্যন্ত চলেছিল (বুখারী)। খানা পিনার ব্যাপারে তিনি (সঃ) একটা বিষয়ে বিশেষ করে খেয়াল রাখতেন যে, কেউ যেন বিনা আমন্ত্রণে অন্যের বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়ার জন্য কখনই না যায়। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে নিমন্ত্রণ করলো এবং এই আবেদনও জানালো যে, আপনি আরও চারজনকে আপনার সঙ্গে নিয়ে আসবেন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঐ ব্যক্তির বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি (সঃ) বুঝতে পারলেন যে, তাঁর সাথে পঞ্চম এক ব্যক্তিও এসেছে। গৃহকর্তা যখন বাইরে এলো তখন তিনি (সঃ) তাকে বললেন, আপনি আমাদের পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, আপনি চাইলে একেও অনুমতি দিতে পারেন, চাইলে না করে দিতে পারেন। গৃহকর্তা বললো, না, না, আমি ওঁকেও দাওয়াত করছি। উনিও ভিতরে আসুন (বুখারী)।

যখন তিনি (সঃ) খাবার খেতেন, বিসমিল্লাহ্ বলেই খাওয়ার শুরু করতেন। এবং যখন খাওয়া শেষ করতেন তখন আল্লাহ্তাআলার প্রশংসা করতেন এই বলে যে, সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্তাআলার যিনি আমাদেরকে খানা পিনা দান করেছেন। অনেক অনেক প্রশংসা। প্রত্যেক প্রকারের ত্রুটি বা কমতি থেকে পবিত্র প্রশংসা। ক্রমবর্ধনশীল প্রশংসা। এমন প্রশংসা নয় যে প্রশংসা করার পর মানুষ মনে করবে যে, ব্যস, হয়ে গেছে, আমি যথেষ্ট প্রশংসা করেছি। বরং এটাই মনে করবে যে, প্রশংসা করার হক্ আদায় করা হলো না। এবং সে কখনই প্রশংসা করা ছেড়ে দিবে না। এবং কখনও মনের মধ্যে এই

ধারণার সৃষ্টি হতে দিবে না যে, খোদাতাআলার এমন কোনও কাজ নেই যা প্রশংসা করবার প্রয়োজন নেই, কিংবা যা প্রশংসা যোগ্য নয়। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে এমনই করো। অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে যে, কখনো তিনি এই বলেও দোয়া করতেন যে, সকল প্রশংসাই আল্লাহ্তাআলার যিনি আমাদের ক্ষুধাও তৃষ্ণা দূর করে দিয়েছেন। আমাদে হৃদয় তাঁর প্রশংসা থেকে কখনই বিমুখ নয় এবং আমরা কখনই তাঁর অকৃতজ্ঞতা করি না।

তিনি (সঃ) সব সময় তাঁর সাহাবাদেরকে উপদেশ দিতেন, পেট ভরবার পূর্বেই খাওয়া ছেড়ে দিতে এবং বলতেন যে, একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত (বুখারী)।

কখনো কোন সময়ে তাঁর (সঃ) বাড়ীতে যদি কোন উপাদেয় খাবার তৈরী করা হতো তখনই তিনি বাড়ীর সবাইকে নসীহত করতেন, পাড়া-পড়শীদের প্রতি খেয়াল রেখো (মুসলিম)। একইভাবে তিনি প্রতিবেশীদেরকে প্রায়শঃ উপঢৌকন পাঠাতেন (বুখারী)।

তিনি (সঃ) তাঁর গরীব সাহাবাগণের চেহারা দেখে সব সময় ঠাহর করার চেষ্টা করতেন যে, তারা তো কেউ না-খেয়ে নেই। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি কয়েকদিন না-খেয়েই ছিলেন। যখন সাত বেলা না-খেয়েই কাটলো, তখন তিনি ক্ষুধায় অস্থির হয়ে মসজিদের দরজায় গিয়ে খাড়া হলেন। এই সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি তাঁকে এমন একটি আয়াতের তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলেন যার মধ্যে গরীবদেরকে খানা খাওয়ানোর হুকুম দেওয়া আছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর কথায় এটাই বুঝলেন যে, এই আয়াতের অর্থ তাঁর জানা নেই। তাই তিনি আয়াতটির মানে করে দিয়ে চলে গেলেন। হযরত আবু হুরায়রা যখন লোকদের কাছে এই ঘটনার বর্ণনা দিতেন তখন রাগ করে বলতেন যে, আবু বকর কি আমার চাইতে কুরআন বেশি জানতো? আমি তো এজন্যই ঐ আয়াত পেশ করেছিলাম যে, এতে করে তাঁর ঐ আয়াতের উদ্দেশ্যের প্রতি খেয়াল যাবে এবং সে আমাকে খাবার দিবে। পরে হযরত ওমরও (রাঃ) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন যে, আমি তাকেও এই আয়াতের মর্ম জিজ্ঞেস করেছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ)-ও আয়াতটির অর্থ বলে দিলেন এবং চলে গেলেন। সহাবারা (রাঃ) চাওয়া বা যাচঞা করাকে অত্যন্ত না-পসন্দ করতেন। আবু হুরায়রা যখন দেখলেন যে, না চাইলে খাবার পাওয়ার কোন উপায় আর নেই তখন তিনি বলছেন, আমি একদম মাতাল হয়ে পড়ে যেতে লাগলাম। কেননা, তখন আমার আর ধৈর্য ধারণ করারও শক্তি ছিল না। কিন্তু আমি তখনও দরজার দিক থেকে মুখ ফিরাইনি, এমন সময়, আমার কানে অত্যন্ত মমতাভরা এক আওয়াজ এলো, কেউ একজন আমাকে ডাকছিল 'আবু হুরায়রা! আবু হুরায়রা!!' আমি মুখ ফেরালাম এবং দেখতে পেলাম যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরের খিড়কী খুলে খাড়া হয়ে আছেন এবং মুচ কি মুচ কি হাসছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, আবু হুরায়রা ক্ষিদে পেয়েছে? আমি বললাম, 'হ্যাঁ, রসূলুল্লাহ্ আমার ক্ষিদে পেয়েছে।' রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাদের ঘরেও খাবার কিছু ছিল না। এখনই এক ব্যক্তি একবাটি দুধ পাঠিয়ে দিয়েছে। তুমি মসজিদে যাও এবং দেখো, সেখানে হয়তো আমাদের মত আরও কোন কোন মুসলমান থাকতে পারে যাদের খাবার প্রয়োজন রয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলছেন, আমি মনে মনে বললাম, আমার তো এত ভুখ লেগেছে যে, ঐ বাটি-ভর্তি সব দুধ আমারই কুলোবে না। তারপর, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও লোক ডাকতে বলছেন ! তাহলে তো আমার ভাগে যা থাকবে তা তো থাকা না-থাকারই শামিল। কিন্তু, কী আর করা! রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুম। গেলাম মসজিদের ভেতরে। দেখলাম ছয় ব্যক্তি বসে আছে। ওদেরকেও সঙ্গে নিলাম এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরের দরজার কাছে গেলাম। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে ঐ দুধের বাটি ঐ ছয় ব্যক্তির এক জনের হাতে দিলেন এবং বললেন,খাও। যখন সে দুধ খেয়ে বাটি থেকে মুখ তুললো তখন তিনি (সঃ) বললেন, আরও খাও। তৃতীয় বারের মত তিনি ঐ ব্যক্তিকে জোর করে দুধ খাওয়ালেন। একইভাবে তিনি ছয়জন মানুষকেই বার বার দুধ খাওয়ালেন। হযরত আবু হুরায়রা বললেন, প্রত্যেক বারই আমি মনে মনে বলছিলাম যে, আমার কাজ সারা। আমার জন্য তো কিছু আর থাকলো না। কিন্তু, যখন ষষ্ঠ ব্যক্তির দুধ পান শেষ হলো তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুধের বাটিটা আমার হাতে দিলেন। আমি দেখলাম কি, তখনও বাটির মধ্যে অনেক দুধ রয়েছে। যখন আমি দুধ পান করলাম, তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জোর করে আমাকেও বললেন, আরও খাও! এইভাবে তিন তিন বার তিনি আমাকেও এ দুধ খাওয়ালেন। এবং আমার খাওয়ার পর বাঁচতি দুধ নিজে পান করলেন এবং খোদাতাআলার শোকর আদায় করতে করতে (ঘরের ভিতরে গিয়ে) দরজা বন্ধ করে দিলেন।

হতে পারে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ হুরায়রা (রাঃ) কে সবার শেষে দুধ পান করতে দিয়েছিলেন এই শিক্ষা দেওয়ার জন্যই যে, তিনি (রাঃ) যেন খোদাতাআলার ওপরে ভরসা রেখে ক্ষুধা নিয়েই বসে থাকেন এবং ইশারা-ইংগিতেও কিছু না চান।

তিনি (সঃ) সবসময় ডান হাত দিয়ে খাবার খেতেন এবং ডান হাত দিয়েই পানি পান করতেন। পানি পান করার সময় মধ্যখানে তিন বার শ্বাস নিতেন। এর মধ্যে একটা স্বাস্থ্যগত হেকমতও ছিল। কেননা, পানি যদি একদমে খাওয়া হয়, তাহলে বেশি পরিমাণে খাওয়া হয়। এবং এতে করে হজমে গোলমাল দেখা দেয়। খাওয়ার ব্যাপারে তাঁর নীতি এটাই ছিল যে, যে খাদ্য পবিত্র ও পরিমিত তা-ই খাওয়া উচিত। কিন্তু, এতে যেন গরীবদের হক্ মারা না যায়, কিংবা মানুষ যেন পেটুক হয়ে না পড়ে। বস্তুতঃ সাধারণভাবে যেমন বলা হয়েছে যে, তিনি অত্যন্ত সাদাসিদে খাবারই খেতেন। তথাপি, কোন ব্যক্তি যদি কোন কিছু তোহ্ফা বা উপহারস্বরূপ নিয়ে আসতো, তাহলে তিনি তা খেতে অস্বীকার করতেন না। কিন্তু, সাধারণতঃ, তিনি খানা-পিনার ব্যাপারে উত্তম বা উপদেয় খাবার সংগ্রহের চেষ্টা কখনই করতেন না। এজন্যই হতে পারে যে, তিনি খেজুরই পসন্দ করতেন বেশি, এবং বলতেন যে, খেজুর ও মোমেন-এর মধ্যে একটা আত্মীয়তা রয়েছে। খেজুরের পাতা, এর ছিলকা এর কাঁচা ফল, পাকা ফল, এর আঁটি সব কিছুই কাজে আসে। এর কোন কিছুই অযথা নষ্ট হয় না। প্রকৃত মুমিনও এমনি হয়ে থাকে। তারও কোন কাজই বৃথা যায় না। বরং তার প্রত্যেকটি কাজই মানব জাতির কল্যাণের জন্য সম্পন্ন হয়ে থাকে (বুখারী)।

পোষাক ও গহণা-পাতির ক্ষেত্রে সরলতা ও খোদা-ভীরুতা (তাক্ওয়া)

পোষাক-এর ব্যাপারেও রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত সাদাসিদা ব্যবস্থাই পছন্দ করতেন। সাধারণতঃ তাঁর পোষাক ছিল কোর্তা (পাঞ্জাবী) এবং তহবন্দ (লুঙ্গী) কিংবা পাঞ্জাবী ও পাজামা। তিনি তাঁর লুঙ্গী বা পাজামা পরতেন হাঁটুর নীচে টাখনুর ওপর পর্যন্ত। হাঁটু বা হাটুর ওপরের কোন অংশ নাংগা হয়ে যাওয়া তিনি পসন্দ করতেন না। তবে বাধ্য-বাধকতা থাকলে সে ভিন্ন কথা। এমন কাপড় যার ওপর ছবি আঁকা থাকতো তা তিনি পসন্দ করতেন না। তা সে পরনের কাপড়ই হোক আর টানানো পর্দা ইত্যাদিই হোক। বিশেষ করে বড় বড় ছবি, যা কিনা শিরক বা অংশীবাদিতার ইঙ্গিতবহ সেগুলোর ছাপযুক্ত কাপড় ব্যবহারের অনুমতি তিনি কখনই দিতেন না। এই ধরনের কাপড় একবার তিনি তাঁর ঘরে লটকানো দেখতে পেয়ে তা খুলে ফেলে দিয়েছিলেন (বুখারী)। তবে, যে সব কাপড়ে ছোট ছোট ছবি আঁকা থাকতো সেগুলির ব্যাপারে তাঁর আপত্তি থাকতো না; কেননা এগুলির মাধ্যমে শিরক-এর প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করার মত ইঙ্গিত থাকতো না। তিনি নিজে কখনই রেশমী কাপড় (সিল্ক) পরতেন না এবং অন্যান্য পুরুষদেরকেও রেশমী কাপড় পরার অনুমতি দিতেন না।

তিনি (সঃ) রাজা বাদশাহদের কাছে প্রেরিত চিঠি-পত্রে ব্যবহারের জন্য তাঁর সীলমোহরের ছাপযুক্ত

একটি আংটি বানিয়ে নিয়েছিলেন কিন্তু, তিনি বলে দিয়েছিলেন, সেটা যেন সোনার আংটি না হয় রূপোর হয়। কেননা, খোদাতাআলা আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য সোনা পরা নিষেধ করে দিয়েছেন। তবে, মেয়েদের জন্য রেশমী কাপড় পড়ারও অনুমতি আছে, সোনার গহনা পরারও অনুমতি আছে। এ ব্যাপারে তিনি উপদেশ দিতেন যে, বাড়াবাড়ি যেন করা না হয়। একবার তিনি গরীবদের জন্য চাঁদা দেওয়ার আহ্বান জানালেন। এক মহিলা একটি কঙ্কণ বের করে তাঁর সামনে রেখে দিলেন। তিনি (সঃ) বললেন, অপর হাতটির কি দোজখ থেকে বাঁচাবার অধিকার নেই? মহিলাটি তখন অপর হাতের কাঁকণটিও গরীবদের জন্য দিয়ে দিলেন। তাঁর (সঃ) বিবিগণের (রাঃ) গহণা-পাতি ছিল না বললেই চলে। অন্যান্য মুসলিম মহিলারাও, তাঁর শিক্ষার অনুসরণে, জেওর অলংকার বানানো থেকে বিরত থাকতেন। তিনি কুরআনী শিক্ষা মোতাবেক বলতেন যে, মাল-সম্পদ জমা করে রাখলে, গরীবদের অধিকার খর্ব করা হয়। এ কারণেই, সোনা-চান্দি ঘরে জমা করে রাখলে, তা জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থাকে ধ্বংস করে ফেলে।। এবং তা পাপও বটে।

একবার হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর (সঃ) কাছে নিবেদন করলেন, এখন তো বড় বড় রাজা-বাদশাহদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রদূতরা আসছেন, আপনার জন্য একটা দামী জুব্বা দরকার, যাতে করে আপনি তা প্রয়োজনে পরতে পারেন। তিনি (সঃ) হযরত ওমরের এই কথা শুনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, খোদাতাআলা তো এজন্য আমাকে পয়দা করেন নি। এসব তো তোষামদের কথা! আমার যে পোষাক সেই পোষাকেই আমি দুনিয়ার সবার সঙ্গেই দেখা-সাক্ষাৎ করবো। একবার তাঁর (সঃ) কাছে একটি রেশমী জুব্বা আনা হলো। তিনি সেটা হযরত ওমরকে তোহ্ফা স্বরূপ দিয়ে দিলেন। পরের দিন তিনি দেখতে পেলেন যে, হযরত ওমর সেটা পরে ঘুরাফেরা করছেন। তিনি এতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ ! আপনিই তো এটা আমাকে তোহ্ফা দিয়েছেন! তিনি (সঃ) বললেন, প্রত্যেকটি জিনিষ তো নিজের ব্যবহারের জন্যে হতে পারে না। অর্থাৎ, এই জুব্বাটা যেহেতু রেশমী ছিল, সেহেতু তাঁর (রাঃ) উচিত ছিল, ওটা তাঁর বিবিকে দিয়ে দেওয়া, কিংবা বেটিকে দিয়ে দেওয়া। কিংবা অপর কেউ হলেও ওটা ব্যবহার করতে পারতো। জুব্বাটা তাঁর (রাঃ) নিজের পোষাক হিসেবে ব্যবহার করা ঠিক হয় নি (বুখারী)।

মূল ঃ হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

অনুবাদ- **শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান**

কুরআনে আল্লাহ্ কি বলেন ইসলামের নামে আমরা কি করি?

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রশংসা কর-তিনি আমাদের সবার সৃষ্টিকর্তা, পরম দাতা ও দয়ালু। তিনি সকল মানুষের ইহলৌকিক সকল কর্মের মহাবিচারক ও পুরস্কারদাতা। সৃষ্টির মাঝে মানুষ সৃষ্টি তাঁর (আল্লাহ্র) সর্বোত্তম ও প্রিয় সৃষ্টি। আল্লাহ্ এ মানুষের ফিতরাতে তাঁর সকল গুণাবলীর উপকরণ ফুঁকে দিয়েছেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ মানুষকে ভাল ও মন্দ বিচার করার ক্ষমতা দিয়েছেন। এ মানুষ পৃথিবীতে কেমন করে জীবন-যাপন করবে, এর জন্যে যুগ, সময় ও যুগের চাহিদা মোতাবেক দু'লাখ চব্বিশ হাজার হেদায়াতকারী বা পথ নির্দেশক পয়গাম্বর, নবী-রসূল পাঠিয়েছেন। এ নবী রসূলের আহ্বানে কেউ সৎপথে পরিচালিত হয়েছে আবার কেউ কেউ এ নবী-রসূলের হেদায়াতকে হাসি বিদ্রুপ করে ঔদ্ধত্যও প্রকাশ করেছে। এ নবী রসূলকে অপমান, লাঞ্ছনা আর মারধোরও করেছে। কুরআন মজীদে শুধুমাত্র কয়েক জন নবী রসূলের নাম পাওয়া যায়। আল্লাহ্ এ সব নবী-রসূলের ঘটনা বর্ণনা করে এর আগের ঘটনাগুলোকে বুদ্ধিমানদের জন্য চিন্তার জন্য তুলে ধরেছেন। হ্যাঁ, এ কথা বলা বাহুল্য যে বর্তমান সময়ে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটেছে যা অতীতের মানুষের ছিল না। অতীতের মানুষগুলো বেশি দিন বাঁচত তবে আমাদের মত তারা এত উন্নত চিন্তা করতে পারত না। তবে সব সময়েই একদল মানুষ বিভিন্নভাবে বা রূপে তার মহান সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজত। মানুষ প্রথমে এক সময় উলঙ্গ অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে গুহা, জংগলে বাস করত। তার পরে অস্ত্র বানাতে শিখেছে, শিকার করতে শিখেছে, পুড়িয়ে খেতে শিখেছে। মানুষের ক্রমবর্ধমান রূপ বর্তমান পর্যন্ত পৌঁছেছে। এখনকার এ প্রজন্মের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম ও আদি মাতা হযরত বিবি হাওয়া। এ মানুষেরা সভ্য, লজ্জা নিবারনে অভ্যস্থ, সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে। কুরআন মজীদ পাঠে জানা যায়, এরা এতটা উন্নতি করল যে, মাটি খুঁড়ে প্রাপ্ত এদের স্থাপত্য কলার নিদর্শন দেখে আমাদের এ যুগের উন্নততম বুদ্ধিবৃত্তির মানুষও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। শুধু মিশরের দিকেই তাকিয়ে দেখুন কেমন করে এরা মমি করত বা পিরামিডগুলো তৈরী করত? এত উন্নত হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কেন ধ্বংস করলেন? এর একটাই জবাব-তারা সৃষ্টিকর্তা রহমান খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে শিরক করেছে অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করেছে বা কেউ কেউ নিজেদেরকে অদৃশ্য আল্লাহ্র চেয়ে শক্তিশালী বলে দাবী করেছে। তারা অন্যদের ওপর যুলুম নির্যাতন করেছে তাদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেছে। আজ এসব শক্তিশালী জাতিকে হয় মাটির নীচে প্রোথিত করে নতুবা সমুদ্রে তলিয়ে দিয়ে আমাদের জন্য নিদর্শন করা হয়েছে।

আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু যে মানুষ সৃষ্টি করে তার গুণাবলী বিকাশের ব্যবস্থা করলেন-সে মানুষ উম্মতে মুহাম্মদীয়া। আর এর কারিগর-নবীনেতা, সৃষ্টির সেরা, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ্ মানুষের হেদায়াতের (সঠিক পথে চলার) জন্য তাঁর মাধ্যমে এক তুলানাবিহীন বাণী দিলেন, 'আল্ কুরআন'। এর কোন কথাতেই 'কোন সন্দেহ নেই' বলে আল্লাহ্ নিজে ঘোষণা দিয়েছেন। এ ঘোষণা মানুষ বা নবী মুহাম্মদের (সঃ) নয়, স্বয়ং আল্লাহ্র।

আল্ কুরআনে আল্লাহ্ মানুষকে তাকওয়াশীল চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, যারা অদৃশ্য সৃষ্টিকর্তার প্রতি ঈমান রাখে, যারা এবাদতগুজার এবং তাদেরকে যা রিয্ক হিসেবে দেয়া হয়েছে-তাথেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে-তাদেরকে এ কুরআন পথনির্দেশনা দেবে। অনেকেই অদৃশ্য খোদাকে বিশ্বাস করে, নামাযও পড়ে তবে সমস্যা কোথায়? প্রত্যহ নামাযে প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে সূরা ফাতেহা পাঠ করে। অথচ অনেকেই জানে না তারা কি পাঠ করে। সূরা ফাতেহাতে শেখানো হয়েছে-সমস্ত প্রশংসা রাব্বুল আলামীনের যিনি দয়াকারী ও সকল কর্মের (তা' ছোট হোক্ বা বড় হোক্) উপযুক্ত ফলদানকারী। আমরা নামাযের সময় কি বার বার আল্লাহ্র কাছে তা স্বীকার করি। আমরা নামাযে ঠিকই কথাগুলো বলি, কিন্তু সব কাজে তাঁর প্রশংসা যেমন করি না-তেমনই ভরসাও করি না। আল্লাহ্ ভরসাকারীকে গ্যারিন্টি দেন, কিন্তু দেখি না বলে অনেকেই এ গ্যারান্টিতে আশ্বস্ত হই না। আমরা নামাযে সূরা ফাতেহার মাধ্যমে সাহায্য চাই, এবাদতও করি, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষ

বা অন্য কিছুর সাহায্য প্রার্থনা করি। প্রত্যহ নামাযে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করি, কিন্তু তিনি (আল্লাহ্) এ ডাক শুনেন না বলেই মনে করি। অথচ আল্লাহ্ মানুষ যখন তাঁকে ডাকে–তখন তিনি মানুষের খুব কাছে চলে আসেন বলে তিনি (আল্লাহ্) আল্ কুরআনে প্রকাশ করেছেন। এ কথা কি আমরা সত্যই বিশ্বাস করি? আর যদি বিশ্বাসে সংশয় থাকে তবে এ নামায কিভাবে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হবে? আল্লাহ্ আছে এ কথা যদি কমপক্ষে দিনে পাঁচবার নামাযে স্বীকার করি তবে কি আমরা কোন অশ্লীল কাজ করতে পারি? তাহলে আসলে কি আমরা তা করি? নামাযও পড়ি, অশ্লীল কাজও করি, অন্যায় অবিচারও করি। এটা কি করতে পারি? এ কথাটা বলার কারণ হলো বাস্তব জীবনে দেখেছি-অনেকেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন, মাঝে মাঝে তাহাজ্জুদও পড়েন, নামায পড়তে পড়তে কপালে কাল দাগ হয়েছে, রোজ হাশরের ময়দানে আল্লাহ্‌র সামনে নামাযী হিসেবে দেখানোর জন্যে, পরনে সাদা ধবধবে উত্তম কাপড়ের পাজামা পাঞ্জাবী, দামী আতরে গায়ের গন্ধে আশে-পাশের লোকেরাও উৎফুল্ল থাকেন, অথচ এরা সমাজে বহু অন্যায় করে। ক্ষেত্র বিশেষে এরা সমাজপতি, ইসলাম রক্ষায় এরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্যও সকল প্রকার অন্যায় করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এসব মানুষকে কি করে একজন ভালো মুসলমান বলা যায়? এরা মুখে ধর্মের কথা বলে, কুরআনের কথাও বলে, অথচ আচরণে উল্টো। এসব মুসলমান নেতারা আবার কেউ কেউ নির্লজ্জের মত প্রকাশ্যে বলে চুরি করি, মিথ্যা বলি আমাদের ঈমান ঠিক আছে আমরা হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শেষ নবী মানি। পাঠকদের কাছে আমার প্রশ্ন, যদি শেষ নবী মেনেই সব অন্যায় জায়েয হয়ে যায়, তবে খৃষ্টানদের পাপে দোষ কোথায়? কুরআন বলে–ওয়ালা তালবিছুল হাক্কা বিল বাতিল ওয়াতাকতুমুল্ হাক্কা ওয়া আন্‌তুম তালামুন অর্থাৎ তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না-এবং-এ তো তোমরা জান। (সূরা বাকারা ঃ ৪৩)

'লানাতুল্লাহি আলাল কাযেবীন' অর্থ মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। (কুরআন)

এবং তোমরা পুণ্য সাধনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ পূণ্য সাধকদের ভালবাসেন। (২ঃ ১৯৫)

আল্ কুরআন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে মানুষের জন্য পৃথিবীতে শেষ ও পূর্ণাঙ্গ বিধান। ঔষধ কোম্পানীগুলো যেমন একটা পেটেন্ট ঔষধ তৈরী করে তার প্যাকেটের ভেতর এ ঔষধের উপকরণ, উপকারিতা, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও সেবন বিধি ছাপিয়ে একটা কাগজ রাখেন এর চাইতে আরও সুন্দর ও গোছালোভাবে আল্ কুরআনে আল্লাহ্ প্রাপ্তি থেকে শুরু করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। এ ব্যবস্থাপত্রটি বুঝাতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন রহমানুর রাহীম সৈয়দনা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)কে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এ মহানবী, মহামানব সৃষ্টির সেরা অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। আগের অনেক নবী-রসূল তাঁর জাতির হেদায়াত করতে গিয়ে তাদের কার্যে বিরক্ত হয়ে আল্লাহর কাছে তাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি কামনা করেছেন। আর আমাদের নেতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নির্যাতিত, রক্তাক্ত হয়েও আল্লাহ্‌র কাছে বলেছেন 'আল্লাহুম্মাহদি কাউমী ফাইন্নাহুম লা'ইয়া'লামুন'। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে হেদায়াত দান করুন– তারা কি করছে এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই।

আল্লাহ্‌র কালাম আল্ কুরআন সুন্দর ও কাংখিত মানুষ গড়ার জন্য সকল সদুপদেশ ও পদ্ধতিতে সমৃদ্ধ আর আমাদের নেতা প্রিয় রসূল (সঃ) পথ প্রদর্শক হিসেবে এ ব্যবহারিক পদ্ধতি শিখিয়েছেন

পাঠক! বর্তমান বিশ্বে আজ যারা ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও মুসলমান নর নারীর ঔরষে ও গর্ভে জন্মে নিজেরা মুসলমান বলে পরিচিত। তারা কি সত্যই সৃষ্টিকর্তা, রহমান ও রাহীম আল্লাহ্‌কে ভয় করেন বা আল্লাহ্ যে তাদের সব কর্মকান্ড দেখেন–তা বিশ্বাস বা তাদের হৃদয়ে অনুধাবন করেন? সত্যিই যদি তা করেন–তাহলে আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রীপুত্র কন্যাদের জন্য যা' করেন, এমনটি কি সহায় সম্বলহীন, এতীম পাড়া-প্রতিবেশীদের জন্য করে থাকেন? এদের বেলায় কি আপনাদের পকেট সংকীর্ণতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত? রমযানের রোযা শেষে ঈদুল ফিতরের বাজার করতে বড় বড় মার্কেটগুলো থেকে আপনার স্ত্রীপুত্র কন্যাদের হাজার হাজার টাকা মূল্যের পোষাক পরিচ্ছদ কেনার সময় কি উত্তরবঙ্গের মঙ্গাপীড়িত ক্ষুধার্ত মানুষ, আশে-পাশের গরীব মানুষ শিশু-বাচ্চাদের কথা মনে পড়ে? তাদের ঈদের খুশীর জন্য চাল, মাংস, সেমাই, মিষ্টি ও নতুন পোষাকের জন্য কি আপনার বাজেটে কোন বরাদ্দ ছিল? আল্ কুরআনের শিক্ষা বা বিধান মোতাবেক আপনার সম্পদে তাদেরও যে হিস্যা রয়েছে সে কথা কি আপনি ভেবেছেন? আমরা শুধু মুখেই বা বাইরেই নিজেদেরকে মুসলমান বলে জাহির করি। ব্যবসায়ী হলে সত্য-মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে ব্যবসার দু'নম্বর আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখিয়ে ঠিকই আয়কর পরিশোধ করছি। অথচ আল্লাহ্‌র যে এ থেকেও বড় হিসাব রক্ষক এবং হিসাবের খাতা রয়েছে তাকি ভেবে দেখেছি? আল্লাহ্‌কে ভয় করে যদি নিজের সম্পদের যাকাত দিতেন, তবে তো বছরে অন্ততঃ একজন দরিদ্রকে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারতেন। এতে ঐ পরিবারও স্বাচ্ছন্দ পেতো আর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আপনার সম্পদকে বরকতপূর্ণ করতেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আল্-কুরআনে বলেন, "ইন্নামা আম্‌ওয়ালুকুম্ ওয়া আউলাদুকুম্ ফিৎনাহ্" (সূরা তাগ্বাবুন-১৬) অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা বিশেষ। আল্লাহ্ আরও বলেন, "লা তান্‌ফাআ'কুম আরহামুকুম্ ওয়ালা-আওলাদুকুম্ ইয়াউমাল্ কিয়ামাহ্"– (সূরা মুমতাহিনা-৪)। অর্থাৎ তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামত দিবসে কোন কাজে আসবে না। তা'হলে আমরা কাদের জন্য সারা দিন রাত এত দৌড়াই? আর তার জন্য আমাদের স্রষ্টা রাব্বুল আলামীন রাহমানুর রাহীম, মালিকিয়াউমিদ্দীন থেকে কেন উদাসীন থাকি? আমরা মুখে যা বলি, কাজে আমরা আল্ কুরআনের নির্দেশনাগুলো মানতে কেন চেষ্টা করি না? আল্লাহ্ তাই ঈমানদারদের উদ্দেশ্যে বলেন–ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আমানু লেমা তাকুলুনা মালা তাফআলুন। কাবুরা মাকতান্ ইন্দাল্লাহি আন্ তাকুলু মালা তাফআলুন (সূরা সাফ-৩ও ৪)। অর্থাৎ হে লোক সকল যারা ঈমান এনেছ! কেন তোমরা এমন কথা বল, যা তোমরা কর না? আল্লাহ্‌র কাছে এটি অত্যন্ত ঘৃণিত যে, তোমরা মুখে এমন কথা বল, যা কাজে পরিণত কর না।

রাহমান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এজন্যই হয়তো আমাদেরকে এ দোয়া করতে বলেছেন (কেননা, তিনি আমাদেরকে ভালবাসেন)– "রাব্বানা–আফরিগ আলাইনা ছাবরাউ ওয়া তাওয়াফ্ ফানা মুসলেমীন (সূরা আ'রাফ-১২৭)। অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সহিষ্ণুতা প্রদান কর এবং মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দিও।

এ, কে, রেজাউল করীম

মুলাকাৎ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর সাথে বাঙ্গালীদের মুলাকাৎ অনুষ্ঠান, তারিখ ৩, অক্টোবর, ২০০০

অনুষ্ঠানের আরম্ভে মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব পবিত্র কুরআন থেকে কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করেন।

১। প্রথম প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্তাআলা জানতেন যে, রসূলে করীম (সঃ) পড়তে জানতেন না তা সত্ত্বেও প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয় "ইকরা" অর্থাৎ পড়। এটার তাৎপর্য কী?

হুযূর উত্তরে বলেন ঃ প্রশ্নকারী মনে হয় জানেন না যে, আরবী শব্দ "ইক্রা" এর দু'টি অর্থ আছে। একটি অর্থ পড়া আর একটি অর্থ তিলাওয়াত করা অর্থাৎ পুনারাবৃত্তি করা। হুযূর পাক (সঃ) ভেবেছিলেন হযরত জিব্রাইল তাঁকে পড়তে বলছেন এজন্য রসূলে পাক (সঃ) বলেছিলেন, "মা আনা বে কারেইন" অর্থাৎ আমি তো পড়তে জানি না। পরে হুযূর পাক (সঃ) বুঝলেন যে, তাঁকে শুধু পুনারাবৃত্তি করতে বলা হচ্ছে তখন হুযূর পাক (সঃ) হযরত জিব্রাইলের সাথে সাথে পুনরাবৃত্তি করতে শুরু করলেন।

২। দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ আমরা পশ্চিমাদেশে আমাদের ধর্ম-কর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারি। অথচ আমাদের নিজেদের দেশসমূহে এক দল আর এক দলের ধর্মপালনে বাধা সৃষ্টি করে। এই সমস্যার সমাধান কী?

হুযূর বলেন ঃ আমি নিকট ভবিষ্যতে এই সমস্যার কোন সমাধান দেখি না। মুসলমানের প্রতি মুসলমানের যে বিদ্বেষ ভয়ানক রূপ নিচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের ভুল বোঝার শক্তি ও ক্ষমতা না দিবেন আমি (হুযূর) এর কোন সমাধান দেখি না। তারা খুব দ্রুত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যদি আল্লাহ্ না করুন এই ধরা পৃষ্ঠ থেকে আহমদীয়াত বা জামাত আহমদীয়া বিলুপ্ত হয়ে যায় বা মিটে যায় তো এই মোল্লারা শাসকের আসনে বসলে দুনিয়াকে ধ্বংস করে ছাড়বে। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহ্তাআলা এটা কোন দিনই ঘটতে দিবেন না। তাই চূড়ান্ত কথা হচ্ছে, আহমদীয়াত ইন্শাআল্লাহ্ অবশ্যই জয়যুক্ত হবে আর এই মোল্লার ধ্বংস হবে।

৩। তৃতীয় প্রশ্ন ঃ কথিত আছে কেয়ামতের ত্রিশ কি চল্লিশ দিন পূর্বে ইমাম মাহ্দী আসবেন, তিনি যুদ্ধ করে অমুসলমানদেরকে মুসলমান বানাবেন তারপর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। হুযূর কী বলেন?

হুযূর বলেন ঃ আপনি যে কথাগুলো শুনেছেন সব ভুল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর হাদীস থেকে যে তথ্য পাওয়া গিয়াছে তা হচ্ছে অন্য রকম। তাছাড়া চিন্তা করুন যে, ইমাম মাহদী যদি কেয়ামত থেকে মাত্র ত্রিশ চল্লিশ দিন পূর্বে আসেন তো তাঁর কার্যকলাপের গুরুত্বই বা কী থাকবে?

৪। চতুর্থ প্রশ্ন ঃ পবিত্র কুরআন শরীফে কোথাও উল্লেখ নেই যে, প্রত্যহ পাঁচবার নামায পড়তে হবে। হুযূর কী বলেন?

হুযূর উত্তরে বলেন ঃ পবিত্র কুরআনে একটি আয়াতে আছে 'আকিমিস সালাতা...' সেই আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ পাওয়া যায়। আর একটি কথা মনে রাখা উচিত যে, পবিত্র কুরআন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তিনি এ পবিত্র গ্রন্থকে ভাল করে বুঝেছিলেন। রসূলুল্লাহ্ এর চেয়ে "পারভেজী" সম্প্রদায়ের লোকেরা কি পবিত্র কুরআনের মর্মবাণীকে বেশী বোঝেন? কারণ এটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে, "পারভেজী"রা বলে থাকেন, দিনে পাঁচবার নামায প্রয়োজন নেই। অথচ রসুলুল্লাহ্ (সঃ) নিজে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তেন এবং তাঁর সুন্নত অনুসারী (পারভেজীরা বাদে) দুনিয়ার তাবৎ মুসলামান দৈনিক পাঁচবার নামায পড়েন।

পঞ্চম প্রশ্ন ঃ ইতিহাসে লেখা আছে হযরত শাহ্ জালাল (রহঃ) বাংলাদেশের সিলেট এসে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর কি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সঙ্গে কোন আত্মিক সম্পর্ক ছিল?

হুযূর বলেন ঃ নিশ্চয়ই ছিল। ঐ রকম আত্মিক এবং আধ্যাত্মিকসম্পর্ক না থাকলে তিনি সফলভাবে ইসলাম প্রচার করতে পারতেন না।

৬। ষষ্ঠ প্রশ্ন ঃ ইউরোপ ও আমেরিকার প্রভাব পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। হুযূর এই প্রভাব সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করুন।

হুযূর বলেন ঃ হ্যাঁ তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব সমগ্র বিশ্বে বিস্তার লাভ করছে। তারা বর্তমানে রাশিয়াতেও এই কাজ করছে, যদিও রাশিয়া এই প্রভাব প্রতিহত করার চেষ্টা করছে কিন্তু সে-ও এই প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছে।

৭। সপ্তম প্রশ্ন ঃ অনেকে বলে আঁ হযরত (সঃ)-এর মি'রাজ শারীরিকভাবে হয়েছিল, এই ধারণাটা ব্রেলভি ধারার মুসলামানদের। এমন

লোকদের কি উত্তর দেয়া যেতে পারে?

হুযূর বলেন ঃ ব্রেলভি মতবাদে একটা স্ববিরোধিতা আছে। একদিকে তারা দাবী করেন রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর শরীরই ছিল না, তিনি নূর (আলো বা জ্যোতিঃ) ছিলেন। আবার তারাই বলেন, তিনি যখন মি'রাজে গেলেন তখন রক্ত মাংসের শরীর নিয়েই আকাশে গিয়েছিলেন। এখন চিন্তা করুন যার কোন শরীর ছিল না তাঁর আবার শারীরিকভাবে মি'রাজ কি করে হতে পারে। আরও একটা কথা হচ্ছে, যে হাদীসে আঁ হযরত (সঃ) মি'রাজের রাতে কা'বা শরীফের নিকট 'হাতীম' নামক স্থানে ঘুমাচ্ছিলেন এবং যখন মি'রাজ শেষ হ'ল তখন তাঁর ঘুম ভাংলো। আরবীতে বলা হয়েছে ঃ "সুম্মাস তায়কাজা"। যার অর্থ হচ্ছে তিনি জেগেগেলেন। এটা বলা হয় নি যে, তখন তিনি ফিরে এলেন। আরও একটা কথা হচ্ছে রসুলুল্লাহ্ (সঃ) তো সব সময়ই আল্লাহ্তাআলার সান্নিধ্যে ছিলেন। তাঁর শারীরিকভাবে আল্লাহ্র সাথে দেখা করার জন্য আকাশে যাওয়ার দরকার কি ছিল? আরও বলা হয়েছে আকাশে একটা কুল বৃক্ষ ছিল। চিন্তা করুন সেই কুল বৃক্ষটাই বা আকাশে কি করছিল? আসল কথা হচ্ছে মি'রাজ একটি আধ্যাত্মিক ঘটনা এবং কুল বৃক্ষ ইত্যাদি সবই প্রতীকীরূপে ছিল।

৮। অষ্টম প্রশ্ন ঃ হযরত রসূলে করীম (সঃ) একেবারে সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকেই "খাতামানবীঈন" ছিলেন তবে তাঁকে অন্যান্য নবীগণের পরে পৃথিবীতে পাঠানো হ'ল কেন?

হুযূর উত্তরে বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) (Potentially) সবারই "খাতামান্নাবীঈন" ছিলেন। তার অর্থ এই নয় যে, তাঁর নিজের জন্মের পূর্বেও একবার তিনি দুনিয়াতে আগমন করেছিলেন। আসল অর্থ হচ্ছে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) "খাতামানবীঈন" ছিলেন আল্লাহ্র মনে পরিকল্পনায়, তাঁর নীল নক্শাতে। বাস্তবে তিনি

অন্য সব নবীর পরে পৃথিবীতে আগমন করেন এবং শেষ শরীয়ত বহন করেন যখন শরীয়ত" চূড়ান্তরূপ ধারণ বা অর্জন করে। এটাই যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার ছিল যে, যখন "শরীয়ত" চূড়ান্তরূপে ধারণ করবে তখনই "খাতামান্নাবীঈন আসবেন।

৯। নবম প্রশ্ন ঃ ইসলামী আইনে একজন পুরুষ চারটি মহিলাকে বিয়ে করতে পারে তো একটি মহিলা চারজন পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে না কেন?

হুযূর উত্তরে বলেন ঃ আমি আগেও এই প্রশ্নের বহুবার উত্তর দিয়েছি। যদি প্রত্যেক পুরুষ চারটি মহিলাকে বিয়ে করে এবং প্রত্যেকটি মহিলা চারটি পুরুষকে বিয়ে করে তো চিন্তা করুন পরিবারগুলোর ও বাচ্চাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে? সন্তান-সন্ততিদের কে দায়িত্ব নিবে? এটাই বা কি করে নির্ণয় করা যাবে যে, কোন শিশু আইনত ঃ কোন পিতা'। এই প্রশ্নটা একেবারেই অর্থহীন!

১০। দশম প্রশ্ন ঃ নামাযে সিজ্‌দা করার সময় আমাদের নাক এবং হাত কীভাবে রাখা উচিত?

হুযূর বলেন ঃ সিজ্‌দার সময় আমাদের দু'কনুই যেন মাটি স্পর্শ না করে আর আমাদের নাক যেন অবশ্যই মাটি স্পর্শ করে।

১১। একাদশ প্রশ্ন ঃ যারা পঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে তারা আরও ভাল মুসলমান কিভাবে হতে পারে?

হুযূর বলেন ঃ নামাযের মাধ্যমে নামাযীদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মান অবশ্যই উন্নত হয়। যারা নামায ছেড়ে দেয় তারা বুঝতে পারে তাদের ঐ মান নিম্নগামী হয়। নামাযের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ঐসব উন্নতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি নামায না পড়ার পূর্বে কোন খারাপ কাজ করতো এবং নামায পড়ার পরেও আবার সে রকম মন্দকাজে লিপ্ত হয়ে যায় তো নামায পড়ে তার কোনই লাভ হ'ল না। ইবাদত অর্থাৎ উপাসনার পরে কোন চারিত্রিক উন্নতি হচ্ছে কিনা এ দিকে লক্ষ্য রাখা অবশ্য কর্তব্য

১২। দ্বাদশ প্রশ্ন ঃ মদ পান করার লাভ ও ক্ষতি কি?

হুযূর বলেন ঃ মদ পান করার ক্ষতি তো প্রায় সবাই জানে। মদ পানের সুফল দেখা যায় যখন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ কারও যদি "নিউমোনিয়া" রোগ হয় তখন তাকে সঙ্গে সঙ্গে "ব্রাণ্ডি" পান করান হয়। এতে ভাল ফল পাওয়া যায়। ঔষধ আকারে কোন কোন সময় এ রকম মদপানে সুফলও লাভ হয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, মদপানে কুফল ও সুফল আছে কিন্তু এর কুফল সুফলের চাইতে পরিমাণে অনেক বেশি।

ত্রয়োদশ প্রশ্ন ঃ মানুষের জন্ম কীভাবে সবচে' প্রথম ঘটে?

হুযূর বলেন ঃ প্রশ্নকারীর বয়স এত কম যে, এই জটিল প্রশ্নের উত্তর তার বোধগম্য করানো কঠিন মনে হচ্ছে। মানুষের জন্ম বৃত্তান্ত বুঝতে হলে বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে বলতে হয়, যা ছোটরা সহজে বুঝতে পারে। প্রথমে এই পৃথিবীতে কোন কিছু ছিল না শুধু আগুন ছিল। চিন্তা করুন এই পৃথিবীতে প্রাণীর জন্ম নিল কী করে? প্রাণীদেরকে কে সৃষ্টি করেছিলেন? প্রাণ আল্লাহ্‌তাআলা সৃষ্টি করেছিলেন।

পঞ্চদশ প্রশ্ন ঃ শিয়া, সুন্নি ও আহমদীদের মধ্যে পার্থক্য কি?

হুযূর বলেন ঃ শিয়ারা বলেন, প্রথম যুগে ইসলামের যে তিন খলীফা হয়েছিলেন তাঁরা অবৈধভাবে খলীফা হয়েছিলেন। তারা মু'মিনগণের খলীফা ছিলেন না, তাঁরা কপটলোকের খলীফা ছিলেন। শিয়াদের ঐসব ধারণা বা বিশ্বাস অদ্ভুত ধরণের। শিয়ারা বলে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে জিবরাঈল ফিরিশ্‌তা ভুল করে 'নবুওয়তের' বাণী দিয়েছিলেন। আসলে হযরত আলী (রাঃ)-কে ঐ বাণী দেয়ার কথা ছিল। এখন বলুন আপনারা কি এসব ব্যাপারে কল্পনা করতে পারেন? শিয়ারা এসব বিষয়ে কোন যুক্তি তর্ক মানতে রাজী নয়। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে 'রহমাতুল্‌লিল আলামীন' বলা হয়। কিন্তু শিয়ারা বলেন রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পরে মাত্র (১০) জন অনুসারী সত্যিকার অর্থে মু'মিন ছিলেন বাকীরা সবাই মুনাফিক (কপট) ছিলেন। এখন বলেন 'রহমাতুল্ লিল্ আলামীন' এর অর্থ কী দাঁড়ালো? রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পূর্বের নবীগণের পর তো অনেক বেশী সংখ্যায় মু'মিন অনুসারী ছিলেন।

আবার সুন্নীদেরও অনেক ধর্ম-বিশ্বাস আমাদের অর্থাৎ আহমদীগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ ব্রেলভীদের কথা আমি এই অধিবেশনেই একটু আগে বলেছি। তারা বিশ্বাস করেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) 'আলেমুল গায়ব' ছিলেন অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলার মতই ভবিষ্যতের অনেক ঘটমান বিষয় জানতেন। এসব কথা একেবারেই ভুল। শুধু আল্লাহ্‌তাআলা 'আলেমুল গায়ব' এবং তিনি যতটুকু রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে জানাতেন ততটুকুই আঁ হযরত (সঃ) জানতেন।

আবার সুন্নীদের মধ্যে 'ওয়াহাবী'রা খুব জোর দিয়ে বলে যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) একেবারে সাধারণ মানুষ ছিলেন। তাঁর জ্ঞান তো শয়তানের জ্ঞানের চেয়েও কম ছিল। এসব ধারণা একেবারেই হাস্যকর। এজন্যই আমরা বলি, এই যুগে আহমদীয়ত হচ্ছে আসল ইসলাম!

১৬। ষষ্ঠদশ প্রশ্ন ঃ মধ্যপ্রাচ্যে যে শান্তি আলোচনা চলছে ইসরাঈলীদের ও প্যালেষ্টাইনবাসীদের মধ্যে-তার সম্পর্কে এই ব্যাপারে হুযূরের মতামত কী?

হুযূর উত্তরে বলেন ঃ আমার মনে হয় না কোন বড় রকম অগ্রগতি নিকট ভবিষ্যতে হবে। ইহুদীরা জেরুযালেমের মসজিদ আক্‌সা ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। প্যালেষ্টাইনের অধিবাসীরা ভীষণ কষ্টে আছে এবং বড় কুরবানী করে যাচ্ছে। ইহুদীরা দুনিয়াতে সবচাইতে খারাপ জাতি। তাই তো পবিত্র কুরআনে তাদেরকে আখ্যা দেয়া হয়েছে 'মাগযুবে আলায়হিম'। তাদের ওপর আল্লাহ্ ক্রোধ বর্ষণ করবেন এবং মানবকুল তাদেরকে অভিশাপ দিবে। আপনারা আমাকে নৈরাশ্যবাদী বলতে পারেন কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রক্রিয়া-এতে আমি কোন আশার আলো দেখি না। ইহুদীরা দু'ধরণের। এক রকম ইহুদী ছিলো হযরত মূসা (আঃ)-এর সত্যিকার অনুসারী। তারা ভাল লোক ছিল। আর এক রকম ইহুদী হচ্ছে যাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তারা শেষ যুগে অবস্থান করবে। আমার ধারণা এখন আমরা শেষ যুগের ইহুদীগণকে দেখছি। এই কারণে আমি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির আপাততঃ শান্তির কোন লক্ষণ দেখি না।

১৭। সপ্তদশ প্রশ্ন ঃ কোন মুসলমান নিজের ঘরে ছবি রাখতে পারে কিনা। আর রাখলে সেই ঘরে নামায হবে কিনা?

হুযূর বলেন ঃ হ্যাঁ, ছবি রাখা যায় এবং সেই ঘরে নামাযও পড়া যাবে কিন্তু ছবিটা নামাযের একেবারে সামনা-সামনি জায়গায় না রাখলেই হ'ল। কারণ ছবি সামনে থাকলে মনোযোগ নষ্ট হতে পারে।

১৮। অষ্টাদশ প্রশ্ন ঃ আমরা নিজেকে দেখতে পারি না কেন? হুযূর প্রশ্নকারী বালিকাকে বলেন তুমি আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজেকে অবশ্যই দেখতে পারবে।

সংকলন ও অনুবাদ ঃ

মরহুম আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

খাদ্য ও পুষ্টি সমাচার

আমরা কোথায় কি খাচ্ছি এ সম্পর্কে আজকালকার পত্রিকাগুলোতে সোচ্চার খবর প্রকাশিত হচ্ছে। এ কাজের অবদানে হয়ত আপামর জনগোষ্ঠী সচেতন হচ্ছেন। কিন্তু এর থেকে কে কতটুকু পরিত্রাণ পাচ্ছেন তা নিয়ে একটু ভাববার অবকাশ থাকে। কারণ হাদীসে এসেছে-"তখন পুণ্যকাজ কমে যাবে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঈমানদারের অভাব হবে"। যেহেতু এটা সত্য, সুতরাং কোথাও গিয়ে যে একটু ভাল খাবার পাওয়া যাবে তা কিন্তু নিশ্চিত হওয়া যায় না, কাজেই পারিবারিকভাবে কিঞ্চিত সচেতন হয়ে কিভাবে স্বল্পদামে একটু ভাল ও নির্ভেজাল খাবার খেয়ে স্বাস্থ্যকে অটুট রাখা যায় সেদিকে দৃষ্টি করাই হচ্ছে আমার আজকের এই প্রচেষ্টা।

পুষ্টি অভাব হেতু কিছু কথা ঃ

জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অপুষ্টি এ দেশের একটি প্রকট সমস্যা। অধিক জনসংখ্যা, খাদ্যে নিরাপত্তার অভাব, দারিদ্রতা, পুষ্টি সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং নিয়ন্ত্রণের সীমিত সুযোগ ও নির্মল পানীয় জলের অভাবই হচ্ছে এই পুষ্টিহীনতার মূল কারণ। পৃথিবীর প্রায় আড়াইশত কোটি লোক বিশুদ্ধ পানি পান থেকে বঞ্চিত। অথচ বিশ্বে প্রতি মিনিটে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ব্যয় হয় বিশ লক্ষ ডলার। আমি সে দিকে না গিয়ে আমার আলোচনাকে আমার বিষয়বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই।

মূলতঃ মা ও শিশুই হচ্ছে এদেশের অপুষ্টির প্রধান শিকার। আমাদের দেশের মায়েদের গড় ওজন ও সাধারণ গড় ওজন ও উচ্চতার চেয়ে বেশ কম, তাই আমাদের প্রায় ৯৪ ভাগ শিশুই নানাভাবে অপুষ্টিতে ভুগছে। অনোপযুক্ত বয়সে বিবাহ, গর্ভধারণ, গর্ভকালীন সময়ে পরিমিত পুষ্টিকর খাবার না খাওয়া এবং আদর্শ পরিচর্যার অভাবের কারণে আমাদের দেশের শিশুরা স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে (২.৫ কেজি এর কম) কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করছে। গর্ভাবস্থায় মাকে পরিমিত আদর্শ খাবার দেয়া, প্রফুল্লমুখর পরিবেশে রাখা, মনঃপীড়া ও শারীরিক নির্যাতন না করা এবং অধিক পরিশ্রম না করানোই উচিত। সাথে ডাক্তারের পরামর্শ ও সেবা নেয়া জরুরী। ফলে জন্মলাভকৃত শিশুটি হবে সুস্থ সবল ও স্বাভাবিক ওজনপ্রাপ্ত। বর্তমানে আমাদের দেশে ভিটামিন-এ, লৌহ ও আয়োডিন জনিত অপুষ্টির ব্যাপকতাই বেশি। লৌহের অভাবহেতু শিশুদের রক্তস্বল্পতা দেখা দেয় ফলে এরা কর্মক্ষমতা ও শেখার শখ হারিয়ে ফেলে। আয়োডিনের অভাবে গলগন্ড রোগ হয় যার কারণে শরীরিক ও মানষিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ভাতের মার, কাঁচা কলা, কচুতে লৌহ (Iron) ও আয়োডিন যুক্ত লবন এবং সামুদ্রিক মাছ ও শেওলায় আয়োডিন পাওয়া যায়। সুতরাং দেশীয় অল্প দামের খাবারও আমাদের শারীরিক প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহে ভাল অবদান রাখে, কেবল ভাতই খাদ্য নহে। অন্যসব মিলিয়ে যে খাবার তাকেই বলা হয় সুষম খাদ্য। চীন ও ইন্দোনেশিয়ায় একজন লোক বছরে যথাক্রমে ৯০ কেজি ও ১১০ কেজি চালের ভাত খায় অথচ আমাদের দেশের লোকেরা খায় ১৮৩ কেজি চালের ভাত। ইহা মোটেই কাম্য নহে। হাদীস মতে প্রতি খাবার সময়ে আমাদের উদরের চার ভাগের দু' ভাগ খাদ্য একভাগ পানি ও একভাগ খালি রাখার নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা এই অমর বাণীকে অনুসরণ করি না। এ প্রসঙ্গে খনার বচন হলো- 'উনো ভাতে দুনো বল, অতি ভাতে রসাতল'।

রাত কানা ঃ

৬ বছরের নীচের শিশুদের মধ্যে এর প্রকোপ বেশি বাংলাদেশের প্রায় ৫ লাখ শিশু প্রতি বছর রাতকানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং ৩০-৪০ হাজার শিশু পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এর লক্ষণ

চোখের সাদা অংশের রং পরিবর্তন হয়ে বাদামী রং ধারণ করা, চোখের পানি কমে গিয়ে সাদা অংশ শুষ্ক হয়ে যাওয়া, চোখ লাল হয়ে যাওয়া, অল্প আলোতে চোখে কম দেখা, উজ্জ্বল আলোতে সরাসরি তাকাতে না পারা, চোখে ফুল পড়া ও চোখের মনিতে ঘা হয়ে যাওয়া, এসবই হলো রাতকানা রোগের লক্ষণ। মূলতঃ ভিটামিন-এ এর অভাবেই হচ্ছে এ রোগের মূল কারণ।

প্রতিকার

শিশুকে ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাবার যেমন-কলিজা, মাছের তেল, ডিম, মাখন খাওয়াতে হবে। এ ছাড়াও সস্তা খাবারের মধ্যে হলুদ রংয়ের সবজি ও ফল যেমন-পাকা আম, পাকা কলা, পাকা কাঠাল, পাকা পেঁপে, গাজর, মিষ্টি কুমড়া বিভিন্ন প্রকার শাক ও সাথে ডাক্তারের পরামর্শানুযায়ী ভিটামিন-'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো ভাল।

আমাদের খাদ্যসমূহে মূলতঃ ৬টি উপাদান আছে। শ্বেতসার, আমিষ ও স্নেহ এই ৩টি হচ্ছে খাদ্যের মূল উপাদান, এছাড়া রয়েছে খনিজ লবণ ভিটামিন এবং পানি।

০১। **শ্বেতসার (কার্বোহাইড্রেড)** ঃ শরীরের তাপ সরবরাহ করা ও দেহকে কিটোসিস রোগ থেকে মুক্ত রাখা এ উপাদানের মূল কাজ, সাধারণতঃ চাল, গম, ভুট্টা, কাউন, আলু, মিষ্টি আলু,, কচু, গুড়, চিনি, মধু এবং মিষ্টি জাতীয় খাবারই হচ্ছে এই উপাদানের উৎস।

০২। **আমিষ (প্রোটিন)** ঃ দেহের গঠন ও বৃদ্ধি সাধন, ক্ষয়পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ , ক্লান্তি দূরীকরণ ও দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করাই হচ্ছে এই আমিষের কাজ। খাদ্যে প্রাণীজ আমিষ হচ্ছে, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, মাখন আর উদ্ভিজ্য আমিষ হচ্ছে চাল, ডাল, চীনাবাদাম, মটরশুঁটি, সীম, মাশরুম, কাঠালের বীচি ইত্যাদি।

০৩। **স্নেহ (ফ্যাট)** ঃ দেহে শক্তি সরবরাহ করা, ত্বক মসৃণ রাখা, খাবার সুস্বাদু করা এবং চর্বিতে বিদ্যমান ভিটামিনগুলোকে (এডিইকে) শরীরের কাজে লাগানোর জন্য সাহায্য করাই হচ্ছে চর্বি জাতীয় খাবারের কাজ। এ উপাদানের প্রাণীজ উৎস হচ্ছে ঘি, মাখন, তৈল, চর্বি আর উদ্ভিজ্য উৎস হচ্ছে-সয়াবীন, সূর্যমুখী, তিল, বাদাম, সরিষা, ডালডা, তুলাবীজ ইত্যাদি।

০৪। **খনিজ লবণ (মিনারেলস)** ঃ আমাদের শরীরে ওজনের ৬ ভাগ খনিজ লবণ দ্বারা গঠিত। এসব লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম, লৌহ, আয়োডিন, ফসফরাস, সালফার তামা জিঙ্ক সোডিয়াম পটাশিয়াম উল্লোখযোগ্য, এরা শরীরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে, এর মধ্যে উল্লোখযোগ্য হলো-শরীরের হার বৃদ্ধি করা, দাঁত উঠা, জীবকোষ গঠন করা, রক্ত জমাট বাঁধানো, রক্ত তৈরি করা, কর্মক্ষমতা সৃষ্টি, জীবনিশক্তি বৃদ্ধি, গর্ভপাত রোধ করা, মৃত বা হাবা সন্তানের জন্মহ্রাস, গলগন্ড প্রতিরোধ, ক্ষতস্থান শুকানো। খনিজ লবণ উপাদানের উৎস হচ্ছে- দুধ, দুধের তৈরী খাবার, পনির, মাখন, মগজ, ছোট মাছ, পাণী ও মাছের হাড়, মাছ, মাছের শুটকি, মাশরুম, সামুদ্রিক মাছ, চিংড়ি, বাদাম, ডাল, ঢেঁরস, সাজনা, সবুজ শাক, গুড় ও আয়োডিনযুক্ত লবণ।

০৫। **খাদ্য প্রাণ (ভিটামিন)** ০১ঃ তেলে দ্রবনীয় ভিটামিন যেমন- এ ডি ই কে। এরা চোখের দৃষ্টি, ত্বকের মশৃণতা, কোষের স্বাস্থ্য

বৃদ্ধি, হাঁড় ও দাঁত তৈরীর কাজ করে এবং সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করে। সাধারণতঃ কচু, লাল, পালং ও পুঁইশাক, গাজর, মিষ্টি কুমড়া, মিষ্টি আলু, পাকা ফল, কলিজা, মাছের তেল, মাখন, ডিমের কুসুম, দুধ তেলে এ ধরণের ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান।

পানিতে দ্রবনীয় ভিটামিন– যেমন ভিটামিন বি ১ (থায়ামিল), বি ২ (রিবোফ্লোবিন), নায়াসিন, ফলিক এসিড, ভিটামিন বি ১২, ভিটামিন সি। এ সকল ভিটামিন খাদ্যের বিপাক প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে নিশ্চিত করে, ঠোঁটের কোণায়, জিহ্বার ঘা, ঠোঁট লালাসহ অন্যান্য সমস্যা যেমন প্লেগ রোগ, চর্মরোগ, পাবনেসিয়াস, এনিমিয়া, চামড়া খসখসে ভাব ও স্কার্ভি রোগ থেকে দেহকে নিরাপদ রাখে। ঢেঁকিছাটা চাল, চর্বিহীন মাংস, কলিজা, ডিম, মাছ, দুধ, মটরশুঁটি, ডাল, সবুজ ও রঙ্গিন শাক সব্জি, সব ধরনের ফলমূল, লেটুস, ধনেপাতা, পুদিনা পাতায় এসবে ভিটামিন প্রচুর পাওয়া যায়।

০৬। **পানি ঃ** শরীরের নানা প্রয়োজনে ও বিপাক প্রক্রিয়ার কাজে সবসময় পানির প্রয়োজন। সব ধরনের তাই দৈনিক প্রচুর পরিমাণ পানি পান করা প্রয়োজন। তবে মনে রাখবেন, "পানির অপর নাম জীবন একথা এখন আর সত্য নয়। বিশুদ্ধ পানির অপর নামই হলো জীবন।"

স্বাস্থ্য রক্ষায় রান্না কৌশল ঃ

গর্ভবতী মেয়েরা তেঁতুল, চুলার মাটি, চিকল (মাটির তৈরী) ইত্যাদি খেতে চায়। তখন তাদের দেহে লৌহ স্বল্পতা দেখা দেয়। লৌহের অভাব হেতু গর্ভবতী মেয়েদের পায়ে পানি হয়ে পা ফুলে যায়। ফলেই তাদের লৌহ খাওয়ার চাহিদা বেড়ে যায়। ভাতের মার ও উল্লেখিত দ্রব্যাদিতে প্রচুর লৌহ (Iron) থাকে, তাই ডাল, চাল ও সবজির সমন্বয়ে খিচুরী খাওয়া ভাল। তাতে করে ভাতের মারটুকু খাওয়া যায় যা স্বাস্থ্যের জন্য হীতকর। এর ফলে জ্বালানীরও সাশ্রয় হয়। রান্নার অদক্ষতা বা অজ্ঞতার কারণেও আমাদের খাদ্যসমূহের অনেক ভিটামিন বিনষ্ট হয় যেমন সবজি কাটার পর মেয়েরা আলু, করলা, পেঁপে, লালশাক, ইত্যাদি খুব ভালভাবে হাত নেড়েচেড়ে ধৌত করে যা মারাত্মকভাবে অন্যায়। তা কখনও করা উচিত নয়। আলু ও পেঁপের সাদা কষ, করলার তিক্ততা ও লাল শাকের লাল রং-ই হলো ভিটামিন যা কাটার পর ধৌত করার ফলে পানির সাথে চলে গেল। সুতরাং আমরা আলু খেলাম না তো বালু খেলাম। লক্ষ্য করে দেখবেন যে, **কোন কোন আলুতে সবুজ অংশ থাকে, তা মারাত্মক বিষ যাকে বলা হয় (Solar poison) তা অধিক জালেও সিদ্ধ হয় না। গর্ভাবস্থায় মায়েরা এ আলু খেলে সন্তান বিকলাঙ্গ হতে পারে।** কাজেই সাবধান থাকুন। রান্নাকালে সবজির পাতিলার মুখ সর্বদা ঢেকে রাখুন আর মাংসের পাতিলার মুখ সব সময়ই খোলা রাখুন যাতে করে মাংসে বিদ্যমান অহীতকর খাদ্যোপাদান উঠে যেতে পারে আর সবজির হীতকর উপাদন সংরক্ষিত থাকে। রান্নার এ কৌশল অবলম্বনে কখনও অবহেলা করবেন না।

একটু বাড়তি চিন্তা ঃ

প্রত্যেক শীত মৌসুমেই আমার স্ত্রী এ বাড়তি চিন্তাটুকু করে থাকে যা আপনারাও কাজে লাগাতে পারেন। বাড়ান্দার এক কোণা দখল করে তাতে ১/২ মাটি ও ১/২ পুরাতন পচা গোবর মিশিয়ে অথবা দুইটি বালতিতে অনুরূপ মাটি গোবর মিশ্রণ তৈরী করে তাতে অল্টারনেট ধনের বীজ ফেলে ধনে পাতার চাষ করতে পারেন। এতে করে শীত মৌসুমে আর ধনে পাতা কেনার প্রয়োজন হবে না। স্বল্প আয়ের সংসারের মেয়েদের জন্য ইহা কিন্তু খুব একটা কর্মবুদ্ধির কাজ নয়? সুতরাং বুদ্ধিকে শুদ্ধি করে চলুন আর কম খরচে ভাল খেয়ে সুস্থ থাকার চেষ্টা করুন।

কচু রান্না ঃ কচু খেলে গলা চুলকায়, এর কারণ হচ্ছে কচুতে অক্সালেট নামক দানা থাকে। খাওয়ার সময় এ দানা গলায় কাটার মত বিধে যায় ফলে গলা চুলকায়। তবে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নহে। কচু কাটার সময় উপরের অংশ পুরু করে কাটতে হবে, কাটার পর ভালভাবে ধুতে হবেএবং সিদ্ধ করে নিতে হবে। রান্নার সময় কচুতে কিছু লেবুর রস, ভিনেগার বা তেঁতুল গোলা পানি দিলে অক্সালেটের দানা দূর করা যায়। কচুর শাক স্বাস্থ্যের জন্য হীতকর।

গাছ থেকে শসা সংগ্রহ ঃ শশা প্রায়সই তিতা হয়। সূর্যের দেখা দেয়ার পূর্বে সকালে গাছ থেকে শশা সংগ্রহ করলে শশাতে আর এই তিক্ততা থাকে না।

অপুষ্টিজনিত রোগ প্রতিরোধ দামি ও সস্তা খাবারের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

অপুষ্টিজনিত রোগ	দামি খাবার	কম দামি খাবার
গা ফোলা বা কোয়ারসিয়ারকর	বড় মাছ, খাশির মাস, গরুর দুধ, গুঁড়ো দুধ,	খিচুরি , ডিম, ছোট মাছ, মটরশুঁটি, বাদাম বিভিন্ন রকম ডাল
হাড্ডিসার বা মেরাসমাস	বড় মাছ, মাংস, ঘি, পাউরুটি, দুধ, মাখন, আঙ্গুর	খিচুরি, কলা, আলু, তেল, গুড়, ছোট মাছ, বাদাম, আটার রুটি, পেঁপে, আম, ভাত,ঘন ডাল ও দেশীয় শাক
রাতকানা (অন্ধত্ব)	কলিজা, আপেল, বেদানা, বড় মাছ, খুরমা, খেজুর	সবুজ শাক, পুঁই, পালং, কচু, ঘন ডাল, ছোট মাছ, গুড়, পাকা পেঁপে, হলুদ রংয়ের অন্যান্য ফল ও সব্জি, বেল, আমরা
রক্তাস্বল্পতা	কলিজা, বড় মাছ, মাংস আপেল বেদানা, আঙ্গুর	মৌসুমী ফল, (পাকা পেঁপে, আম, কাঠাল, পেয়ারা, আমড়া বেল) মিষ্টি কুমড়া, লাল শাক
মুখের কোনে ঘা	দুধ, কলিজা, আপেল, বেদানা, বড় কলা, মাছ, আঙ্গুর মাংস	ডিম, বাদাম, আম, কাঁঠাল, পেঁপে, ডালিম, লেবু, জাম্বুরা, আমড়া, আমলকি, লালশাক, কচুশাক, পুঁইশাক।
গলগন্ড বা ঘ্যাগ	সামুদ্রিক বড় তাজামাছ	আয়োডিন মিশ্রিত লবণ

মোহাম্মদ ফজলে এলাহী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশের ২৯তম ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২২ ও ২৩শে অক্টোবর লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশের ২৯তম ইজতেমা ও ১২তম মজলিসে শূরা অনুষ্ঠিত হয়। অত্যন্ত সুন্দর ভাবে এই অনুষ্ঠানদ্বয় অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জামাত হতে ৭০০ (সাত শতের) অধিক লাজনা-নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ্ ।

মাহমুদা আখতার
জেনারেল সেক্রেটারী
লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ

আনসারুল্লাহ্র জেলা ইজতেমা (বৃহত্তর রংপুর) ২০০৫ অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্তাআলার অশেষ ফযলে গত ৭ই সেপ্টেম্বর ২ দিন ব্যাপী তালীমুল কুরআন ক্লাস এবং ৯ই সেপ্টেম্বর ১ দিনের জেলা ইজতেমা রংপুর মসজিদে অত্যন্ত সুন্দর ও সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। ধর্মীয় জ্ঞানের ওপরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও খেলাধূলা অনুষ্ঠিত হয়। বৃহত্তর রংপুরে আওতাধীন ৭টি মজলিস থেকে প্রায় ৬০ জন আনসার উক্ত ক্লাস ও ইজতেমায় যোগদান করেন। কেন্দ্র থেকে মোহতারম সদর, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্ আলহাজ্ব আহমদ তবশীর চৌধুরী এবং জনাব জাহাঙ্গীর বাবুল উক্ত ইজতেমায় যোগদান করেন।

আনসারুল্লাহ্র জেলা ইজতেমা (বৃহত্তর দিনাজপুর) ২০০৫ অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্তাআলার অশেষ ফযলে গত ৩১শে আগষ্ট থেকে ১লা সেপ্টেম্বর ২ দিন ব্যাপী তালিমুল কুরআন ক্লাস ও ২রা সেপ্টেম্বর ১দিন ব্যাপী জেলা ইজতেমা আহমদনগর মসজিদে অত্যন্ত সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্ । বৃহত্তর দিনাজপুরের আওতাধীন ৪টি মজলিস থেকে প্রায় ৮০ জন আনসার উক্ত ক্লাস ও ইজতেমায় যোগদান করেন। ২রা সেপ্টেম্বর তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে ইজতেমার কর্মসূচী শুরু হয়। বাদ ফজর ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশন হয়। এর পরে ধর্মীয় জ্ঞানের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয়।

খন্দকার মাহবুব-উল ইসলাম
রিজিওনাল কায়েদ, উত্তরবঙ্গ

দোয়ার এলান

আস্সালামু আলাইকুম। আমি আমাতুস সামী তাহেরা (ঐশী), ওয়াকফে নও নং ১০৪৩৪(A)। আমি চট্টগ্রামের চন্দনাইশের গাছবাড়ীয়া আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় পঞ্চম শ্রেণীতে টেলেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করেছি। আমি ভবিষ্যতে একজন আদর্শ মানবী হতে চাই। সেজন্য আমি জামাতের সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী। উল্লেখ্য আমি নাটাই নিবাসী জনাব আব্দুল মতিন সাহেব এবং ঘাটুরা নিবাসী জনাব আব্দুর রশিদ সাহেবের নাতনী।

মজলিসে আনসারুল্লাহ্, ঢাকার ১৮তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৫, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৫ইং রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার মজলিসে আনসারুল্লাহ্ ঢাকার ১৮তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্ ।

১৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব ইজতেমার উদ্বোধন করেন মোহতরম মীর মোবাশ্বের আলী, ভারপ্রাপ্ত ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। সম্মানিত মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম আহমদ তবশীর চৌধুরী, সদর মজলিসে আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ এবং মোহতরম আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা। ইজতেমায় ৯১ জন আনসার উপস্থিত ছিলেন। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন, জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান। চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি, জনাব সফিক আহমদ, যয়ীমে আ'লা আনসারদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তৃতা করেন। উদ্বোধনী অধিবেশন শেষে ইজতেমার বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। আনসারগণ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে সকল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য এবারের ইজতেমায় সত্তরোর্ধ আনসারদের বিশেষভাবে সম্মানিত করার ব্যবস্থা করা হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর বাদ জুমুআ ইজতেমার সমাপনী অধিবেশন হয়। সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম শাহাব উদ্দিন আহমদ, নায়েব আমীর-৩, আ. মু, জা, বাংলাদেশ। সম্মিলিত দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি হয়।

বশীর উদ্দীন আহমদ
মোন্তাযেম উমুমী
মজলিসে আনসারুল্লাহ, ঢাকা

উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ গমন দোয়ার আবেদন

আমার তৃতীয় ছেলে জহির আহমদ (জাফর) ২১-১০-২০০৫ইং তারিখে ছাত্র ভিসা পেয়ে ফ্রান্স গমন করেছেন। তার আশু কামিয়াবীর জন্য সকল ভাই বোনদের খেদমতে বিশেষ দোয়ার আবেদন করছি। করুণাময় আল্লাহ্তাআলা যেন তার আশা পূর্ণ করেন।

আব্দুল মতিন (নাটাই), প্রেসিডেন্ট
আঃ মুঃ জাঃ নাটাই, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

এলান

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের সকল মুখলেস ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলা যাচ্ছে যে আমীরুল মু'মেনীন, সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) আগামী ২০০৮ সালের মধ্যে লাজেমী চাঁদাদাতা আহমদীগণের শতকরা ৫০ জনকে নেযামে ওসীয়্যতে শামেল হবার তাহ্রীক করেছেন। সে লক্ষ্য অর্জনে সকল স্থানীয় জামাতের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবকে ইতোমধ্যে পত্র লিখা হয়েছে। যুগ ইমাম-এর এ বরকতপূর্ণ তাহ্রীকে "লাব্বায়েক" বলে আল্লাহ্তাআলার আশীষ লাভের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য আপনাদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

নিজ নিজ স্থানীয় জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট অথবা সরাসরি খাকসারের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা গ্রহণ করা যেতে পারে।

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান
সেক্রেটারী ওসীয়্যত ও
সদর মজলিসে মুসীয়ান
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43,NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন ।

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিড়ি রেস্তোরা ১

নীচতলা

রোড নং ৪৫ প্লট ৩২/১

গুলশাল ২ ঢাকা ।

ফোন ঃ ৯৮৮-২১২৫

ধানসিড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা

(রাপা প্লাজার পার্শ্বে)

ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

পাক্ষিক আহ্‌মদীর অব্যাহত অগ্রযাত্রায় আমাদের অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217

Phone : 414550, 9331306

New Vol. No. 68 ❑ 9th Issue
Novembe

Fortnightly

The AHMADI

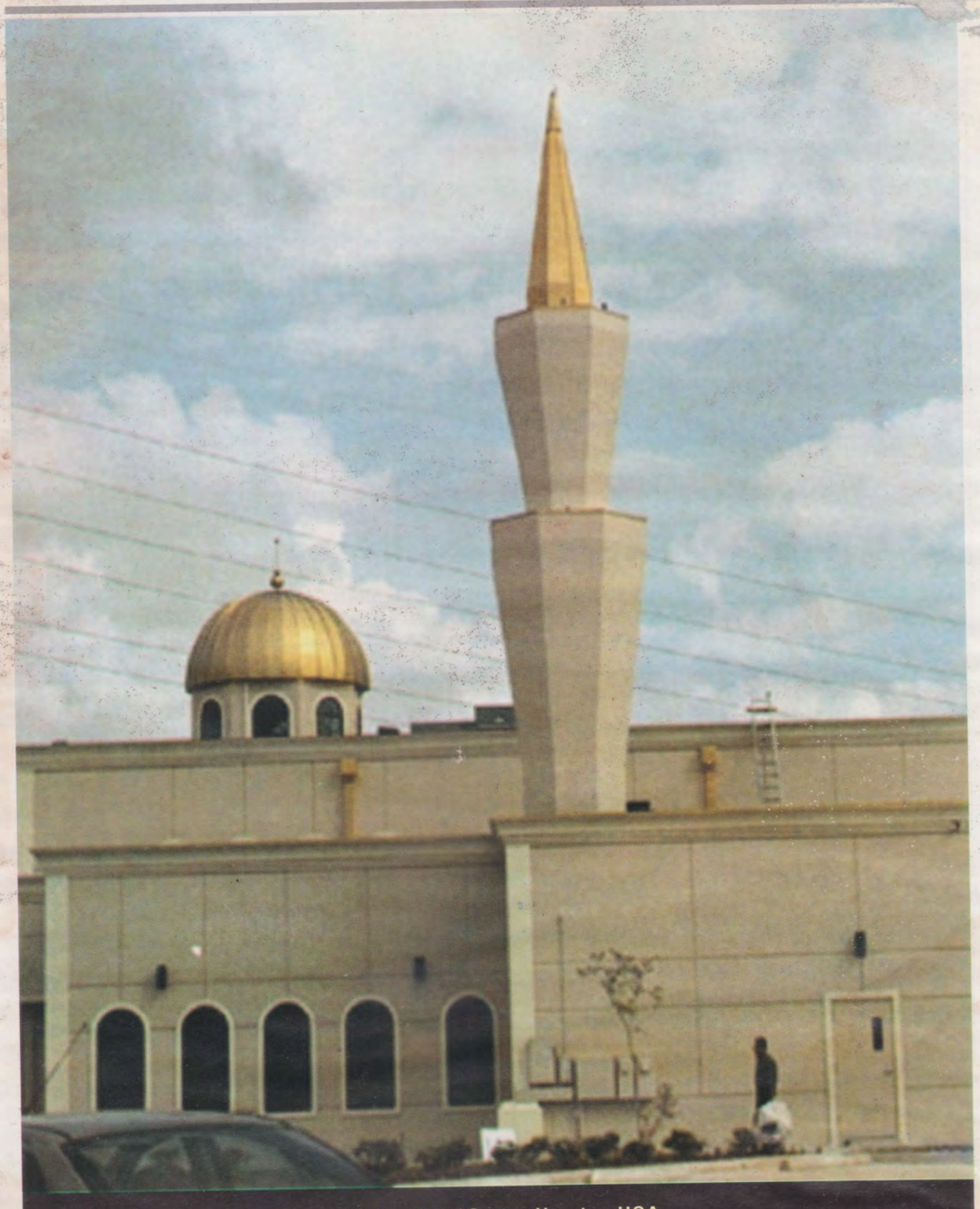

Masjid - Baitul Samee, Houston, USA

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge: Mahbub Hossain, National Secretary Ishaat
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925 E-mail: amgb@bol-online.com